KRISHI CHANDRIKA

BEING A TREATISE ON INDIAN AGRICULTURE WITH THE MODERN VIEWS ON THE SUBJECT

BY

UMES CHANDRA SEN GUPTA.

কৃষি-চন্দ্রিকা।

শ্রীউমেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত।

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা :

৩৩নং মুসলমানপাড়া লেন, সুধা-যন্ত্রে

শ্রীললিতমোহন দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮৯৩ খৃঃ।

বিজ্ঞাপন।

—•—

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তক প্রথম মুদ্রিত হয়। ঐ সালে কলিকাতা "ফ্যামিলি লিটারারী ক্লাবে" কৃষি সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিবার জন্য আমি আহূত হই। এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপিও ঐ সভায় পঠিত হইয়াছিল। মহাত্মা উড্রো প্রভৃতি কয়েকজন সাহেব ও দেশীয় অনেক গণ্যমান্য লোক উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহারা সকলেই আমাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন; অধিকন্তু উড্রো সাহেব মহোদয় বালকদিগের পাঠোপযোগী সরল ভাষায় পুস্তকখানি মুদ্রিত করিবার জন্য আমাকে অনুমতি করেন। তাঁহার অনুমত্যানুসারে ঐ সালেই উহা মুদ্রিত হইলে তিনি একশত খণ্ড পুস্তক ক্রয় করেন এবং প্রসিদ্ধ উদ্ভিজ্জ বেত্তা সি, বি, ক্লার্ক, কলিকাতা নর্ম্যাল স্কুলের কৃষি-বিদ্যার শিক্ষক বাবু হরিমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকের নিকট পুস্তক পাঠাইয়া পুস্তক সম্বন্ধে তাঁহাদের মত গ্রহণ করেন। পরে তিনি ক্লার্ক সাহেবের মন্তব্যানুসারে পুস্তকের স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিয়া পুস্তকখানি দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কন জন্য আমাকে উপদেশ দেন। কিন্তু ঘটনাবশতঃ সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তক তাঁহাকে অতি অসময়ে প্রদান করা হইয়াছিল। তিনি সংশোধিত পুস্তক দর্শনে অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহার পর

অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। আর কিছুদিন জীবিত থাকিলে, বোধ হয় পুস্তকখানি বালকদিগের পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইত। যাহা হউক, উদ্দেশ্য সফল না হইলেও ঐ মহাত্মা অনুগ্রহ করিয়া আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি সম্বন্ধে যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য আমি তাঁহার উদ্দেশে আন্তরিক ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

এস্থলে ইহাও প্রকাশ করা কর্ত্তব্য যে, ইহার পর মাননীয় বারিষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু, ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগীর প্রভৃতি কতিপয় মহানুভব ব্যক্তির প্রদত্ত উৎসাহ ও পরামর্শে আমি সাধারণের ব্যবহারযোগ্য কৃষি বিষয়ক অন্য পুস্তক লিখিয়াছি কিন্তু কৃষি-চন্দ্রিকা আর মুদ্রিত করি নাই। সংপ্রতি শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ বাঙ্গালা বিদ্যালয় সমূহে কৃষি শিক্ষা দিতে মনোযোগী হইয়াছেন দেখিয়া, কোন সদাশয় মহাত্মার উপদেশানুসারে উহা পুনরায় মুদ্রিত করিলাম। এবার অপেক্ষাকৃত জটিল বিষয় পরিত্যক্ত এবং বিশেষ প্রয়োজনীয় বোধে কোন কোন নূতন বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। ফলতঃ দীর্ঘকাল কৃষিসংস্রষ্ট ব্যাপারে লিপ্ত থাকায় যে অভিজ্ঞতা টুকু লাভ করিয়াছি, তদনুসারে এবার বিশেষ সতর্কতার সহিত পুস্তকের আদ্যন্ত সংশোধন করিয়াছি। এখন ইহা বালকদিগের উপকারে আসিলে পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

বরাহনগর,
২০শে জানুয়ারি ১৮৯৩ খৃঃ। } শ্রীউমেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

কৃষি-চন্দ্রিকা।

কৃষিকার্য্য।

ভূমিকর্ষণ ও বীজবপন দ্বারা শস্যাদির উৎপাদন ক্রিয়াকে কৃষিকার্য্য বলে। যাহারা এই কার্য্য করে, তাহাদের নাম কৃষক। চলিত কথায় কৃষি-কার্য্যকে চাষ-কার্য্যও বলিয়া থাকে; এজন্য কৃষক-দিগের আর একটি নাম চাষা।

আমরা প্রতিদিন যে সকল শস্য, ফলমূল আহার করি, তাহা কৃষিকার্য্য দ্বারা উৎপন্ন হয়; যে বস্ত্র পরিধান করি, তাহাও কৃষি-কর্ম্মজাত কার্পাসাদি হইতে প্রস্তুত হয়; যে গৃহে বাসকরি, তাহার অধিকাংশ দ্রব্য কৃষিকর্ম্মার্জ্জিত। অতএব কৃষিকর্ম্ম দ্বারা পৃথিবীর মহদুপকার সাধিত হইতেছে। কৃষি-কার্য্যের অভাবে আমরা কখনই জীবন ধারণ করিতে পারি না।

ভারতবর্ষে কৃষির অবস্থা।

পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে কৃষির বিলক্ষণ চর্চ্চা ছিল। প্রাচীন হিন্দুরা কৃষিকার্য্যকে অতিশয় আদর ও সম্মান করিতেন। ঋষিরা স্বহস্তে ভূমিকর্ষণ ও জলসিঞ্চন প্রভৃতি কার্য্য করিয়া স্ব স্ব আশ্রমে বৃক্ষাদি উৎপাদন করিতেন। হিন্দুদিগের পবিত্র তীর্থস্থান কুরুক্ষেত্র নামক বিস্তীর্ণ ভূমি, মহারাজ কুরু স্বহস্তে চাষ করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এদেশের সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত লোকেরা কৃষিকার্য্যকে অতি হেয়কার্য্য বিবেচনা করেন; তাঁহারা কৃষিব্যবসায় একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন। অশিক্ষিত, দরিদ্র, নীচ শ্রেণীস্থ লোকেরাই এখন এদেশে কৃষি-ব্যবসায়ী হইয়াছে; এজন্য দিন দিনই এদেশে কৃষির হীনাবস্থা ঘটিতেছে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই, আমাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষের মৃত্তিকা অত্যন্ত উর্ব্বরা; নিতান্ত অযত্নে বীজ ছড়াইলেও উর্ব্বরতাগুণে তাহা একেবারে নিস্ফল হয় না। যদি এদেশীয় কৃষকেরা মূর্খ ও নির্ধন না হইত এবং কৃষিকার্য্য সম্পাদনে তাহাদের প্রকৃত যত্ন ও উদ্যম থাকিত, তাহা হইলে স্বভাবতঃ উর্ব্বরা ভারতভূমিতে কৃষিকার্য্য করিয়া কৃষকেরা যে প্রচুর লাভবান হইতে পারিত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কৃষি যে অতি লাভের ও সুখের ব্যবসায় এবং ভারতবর্ষ যে তাহার উপযুক্ত ক্ষেত্র, নীলকর ও চা-কর সাহেবদের কার্য্যই তাহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও কৃষিবিষয়ে শিক্ষিত ধনাঢ্য লোকেরা অমনোযোগী রহিয়াছেন, ইহা দেশের দুর্ভাগ্যের বিষয়। ফলতঃ যাবৎ তাঁহারা কৃষিকার্য্যে উদাসীন থাকিবেন, তাবৎ এদেশে কৃষির উন্নতির আশা করা যায় না। যে শ্রেণীর লোকের প্রতি এখন কৃষিকার্য্যের ভার আছে, তাহাদের শুভাশুভ চিন্তা করিবার ক্ষমতা নাই, অজ্ঞানতা ও নির্ধনতায় তাহাদিগকে অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখিয়াছে। অতএব এমন লাভজনক স্বাধীন ব্যবসায়ের প্রতি শিক্ষিত ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের মনোযোগ আকর্ষণ একান্ত প্রার্থনীয়।

মৃত্তিকা ভেদ।

মৃত্তিকা দুই প্রকার;—এঁটেল ও বালি। যে মাটিতে জল ঢালিলে তাহা সহসা না শুষিয়া জমা হইয়া থাকে এবং যাহা সূর্য্যোত্তাপে শীঘ্র উত্তপ্ত হয় না ও হাতে লইয়া টিপিলে অঙ্গুলিতে লাগিয়া যায়, তাহাকে এঁটেল মাটি কহে। বেলেমাটির লক্ষণ ইহার বিপরীত।

অর্থাৎ বালিতে জল ঢালিলে তাহা শীঘ্র শুষিয়া যায়; বালি সূর্য্যোত্তাপে শীঘ্র উত্তপ্ত হয় এবং হাতে লইয়া টিপিলে অঙ্গুলিতে জড়াইয়া লাগে না। বিশুদ্ধ এটেল বা শুদ্ধ বালিতে কোন প্রকার বৃক্ষ জন্মিতে পারে না। উহারা উভয়ে অথবা উহাদের সহিত লোহ, গন্ধক, লবণ, চূণ ও পটাশ প্রভৃতি পদার্থের মিশ্রণে যে মৃত্তিকা জন্মে, তাহাই কৃষিকার্য্যের উপযোগী। আমরা সচরাচর যে মৃত্তিকা দেখি, তাহা প্রায়ই মিশ্র-মৃত্তিকা।

আম, জাম প্রভৃতি বৃক্ষের শিকড়ের ন্যায়, যে সকল উদ্ভিজ্জের শিকড় শাখা-বিশিষ্ট হইয়া মৃত্তিকার চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হয়, তাহাদের পক্ষে এটেল মৃত্তিকার ভাগ অধিক থাকে এরূপ মিশ্র-মৃত্তিকা উপযোগী। ধান্য, গোধূম প্রভৃতি শস্যের পক্ষেও ঐরূপ মৃত্তিকা উত্তম। আলু, মূলা, ওল, কচু প্রভৃতির ন্যায় যাহাদের কাণ্ড, মৃত্তিকাভ্যন্তরে থাকিয়া বৃদ্ধি পায় এবং মূল কোমল ও সরস, তাহাদের জন্য বালি ও এটেলের সমভাগবিশিষ্ট মিশ্র-মৃত্তিকা উত্তম। আর তর্ম্মুজ, খর্ম্মুজ, ফুটি প্রভৃতির ন্যায় যাহাদের কাণ্ডে ও ফলে জলের অংশ বেশী, তাহাদের জন্য বালির অংশ অধিক থাকে, এরূপ মিশ্র-মৃত্তিকা উপযোগী। ফলতঃ উদ্ভিজ্জদিগের স্বভাবানুসারে কাহারও পক্ষে এটেলের

ভাগ অধিক, কাহারও পক্ষে বালির ভাগ অধিক এবং কাহারও পক্ষে উভয়ের সমান ভাগবিশিষ্ট মিশ্র-মৃত্তিকা উপযোগী হইয়া থাকে।

পলিমাটি নামে একপ্রকার মিশ্রমৃত্তিকা আছে, তাহার ন্যায় কোমল ও উর্ব্বরা মাটি প্রায় দেখা যায় না। কোন স্থানে চারিদিকের বর্ষার জল গড়াইয়া আসিয়া দুই এক দিন অবস্থানপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলে সেই স্থানে সরের মত যে কাদা জমা হয়, তাহাই পলিমাটি। নদী এবং খালের কূলেও পলিমাটি জমিয়া থাকে। গাছপাতা পচিয়া মৃত্তিকার উপরে যে সার জমে, তাহা এবং লৌহাদি ধাতু বর্ষার জলে ধৌত হইয়া আসে বলিয়া পলিমাটিতে উদ্ভিজ্জ ও ধাতবীয় সারের ভাগ খুব বেশী। এই মাটিতে সকল প্রকার উদ্ভিজ্জই জন্মিতে পারে। আম কাঠালাদি ফলবৃক্ষ, এই মৃত্তিকায় অতিশয় তেজস্বী হয়। গোল-আলু, মূলা, হরিদ্রা, পলাণ্ডু এবং ধান্যাদি সর্ব্বপ্রকার শস্যও এই মাটিতে উত্তম জন্মে। ইহার উর্ব্বরতা শক্তি এত প্রবল যে, এই মাটিতে কোন প্রকার সার দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

এটেল, বালি, উদ্ভিজ্জসার ও চূর্ণ প্রভৃতি মিশ্রিত হইয়া আর এক প্রকার মিশ্রমাটি স্বভাবতঃ জন্মে, তাহাকে দো-আঁশ মাটি কহে। দোআঁশ মাটিও

কোমল এবং উর্ব্বরা। অধিকাংশ শাকশব্জি ও ফলবৃক্ষের পক্ষে এই মাটি উপযোগী।

ক্ষেত্র ভেদ।

আকৃতি ও প্রকৃতি ভেদে ক্ষেত্র পাঁচ প্রকার। যথা,—সমতল, কূর্ম্মপৃষ্ঠ, ক্রমনিম্ন, বিল ও জোল। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত তিন প্রকার উচ্চ এবং শেষোক্ত দুই প্রকার নিম্নক্ষেত্র।

যে ক্ষেত্র পার্শ্বস্থ ভূমির সহিত সমান উচ্চ, সুতরাং পৃষ্ঠদেশ সমান, তাহাকে সমতল ক্ষেত্র বলে। কৃষকেরা ইহাকে একতালা ক্ষেত্র কহে। পৃষ্ঠদেশ সমতল বলিয়া বৃষ্টির জল বা সেচিত জল ইহার সর্ব্বত্র সমানরূপে ব্যাপ্ত হয়, এজন্য মৃত্তিকার সার ধৌত হইয়া অন্যত্র যাইতে পারে না। কৃষিকার্য্যের পক্ষে এইরূপ ক্ষেত্র অত্যন্ত সুবিধাজনক। উচ্চ ভূমির মধ্যে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ক্ষেত্র।

যে ভূমি চতুঃপার্শ্বের জমি অপেক্ষা উচ্চ এবং দেখিতে কচ্ছপের পৃষ্ঠের ন্যায়, তাহার নাম কূর্ম্মপৃষ্ঠ। কৃষকেরা ইহাকে শিষেটান ক্ষেত্র বলে। বৃষ্টির জলে ইহার পৃষ্ঠদেশের মৃত্তিকা ধৌত হইয়া অন্য

স্থানে গিয়া পতিত হয়; এজন্য সার দিলেও এইরূপ ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইতে পারে না; সুতরাং ইহা কৃষিকার্য্যের পক্ষে বড় সুবিধাজনক নহে।

যে ক্ষেত্র ক্রমশঃ নিম্ন হইয়া অবশেষে কোন নিম্নতর জলাশয়াদির সহিত মিলিত হয়, তাহার নাম ক্রমনিম্ন ক্ষেত্র। কৃষকেরা ইহাকে আড়গড়ানে ক্ষেত্র বলে। বর্ষার জল ইহার গাত্র ধৌত করিয়া স্রোত বহিয়া জলাশয়াদিতে গিয়া পড়ে; তাহাতে ইহার উৎপাদিকা শক্তি ক্রমশঃই হ্রাস হইয়া থাকে। উচ্চভূমির মধ্যে এইরূপ ক্ষেত্র সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট।

চতুর্দ্দিকের ভূমি অপেক্ষা মধ্যের ভূমি নিম্ন হইলে, তাহাকে 'জোল' বলে। জোলজমি বিস্তৃত হইলে 'কুড়ি ক্ষেত্র' নামে অভিহিত হয়। জোলের আকার কূর্ম্ম-পৃষ্ঠের বিপরীত। চারিদিকের উচ্চভূমি হইতে বর্ষার জল গড়াইয়া জোল জমিতে পতিত হওয়ায়, পলি পড়িয়া ইহার উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পায়। এই ক্ষেত্রে শালিধান্য অতি উত্তম জন্মে।

চতুর্দ্দিকের উচ্চভূমির মধ্যস্থ সুবিস্তীর্ণ গভীর ক্ষেত্র, বিল নামে প্রসিদ্ধ। জোল জমির ন্যায় বিলান জমিতেও চারিদিকের জল গড়াইয়া পড়িয়া পলি সঞ্চিত হয়, সুতরাং বিলান জমিও উর্ব্বরা। কিন্তু

গভীরতার তারতম্যানুসারে ইহার উর্ব্বরতার হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বিলান ক্ষেত্রে ধান্য ব্যতিরেকে প্রায় অন্য কোন ফসল হইতে পারে না। বোরো, জলি প্রভৃতি ধান্য বিলান জমিতে জন্মে।

— — —

অনুর্ব্বরা ভূমির সাধারণ লক্ষণ।

কোন ক্ষেত্রের মৃত্তিকার উর্ব্বরতা পরীক্ষা করিবার সাধারণ উপায় এই,—তথায় যে সকল তৃণাদি উদ্ভিদ আছে, তাহাদের বৃদ্ধিশীলতার প্রতি দৃষ্টি করিবে। যদি তাহাদিগকে সতেজ দেখ, তবে জানিবে সে স্থানের মৃত্তিকা উর্ব্বরা। কারণ তৃণজাতি স্বভাবতঃ উর্ব্বরা মৃত্তিকা না পাইলে, কখন সতেজ হইতে পারে না।

অপর ঐ ক্ষেত্রের কিয়দংশ অত্যন্ত শুষ্ক মৃত্তিকা ও কিয়দংশ ভিজা মৃত্তিকা লইয়া অঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া দেখিবে, যদি শুষ্কাংশ সাতিশয় কঠিন হয় এবং ভিজা অংশ অঙ্গুলিতে এমন জড়াইয়া যায় যে, তাহা তুলিয়া ফেলিতে বিশেষ যত্ন পাইতে হয়, তবে সে মৃত্তিকা অনুর্ব্বরা; তাহাতে কৃষিকার্য্য উত্তমরূপ চলিতে পারে না। কিন্তু যদি মৃত্তিকাতে কিছু আঠার সঞ্চার থাকে,

অথচ অঙ্গুলিতে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন না হয়, তাহা হইলে সেই মৃত্তিকাকে উর্ব্বরা বলিয়া জানিবে।

বীজ রোপণ।

জগদীশ্বর উদ্ভিজ্জ বংশ অব্যাহত রাখার জন্যই বীজের সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব বীজমাত্রেরই যে অঙ্কুরোৎপাদনশক্তি আছে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে অনেক সময়ে আমরা বীজ রোপণ করিয়াও তাহার যে অঙ্কুরোৎপত্তি দেখিতে পাই না, তাহার দুইটী কারণ অনুমিত হয়। প্রথম কারণ—বীজের অঙ্কুরোৎপাদন শক্তি নষ্ট হইয়া গেলে বীজ রোপণ করা; দ্বিতীয় কারণ বীজের প্রতি অপব্যবহার অর্থাৎ যে বীজ অঙ্কুরিত হইতে যে পরিমাণ জল, বায়ু ও উত্তাপের আবশ্যক তাহা কিছু মাত্র বিবেচনা না করিয়া যে সে স্থানে, যে সে সময়ে, তাহাদিগকে রোপণ করা।

সর্ব্বজাতীয় বীজের অঙ্কুরোৎপাদনশক্তি সমকাল স্থায়ী নহে। এমন অনেক উদ্ভিদ আছে যে, ফল পক্ক হওয়ার অল্পকাল পরে তাহাদের বীজ রোপণ না করিলে অঙ্কুর জন্মে না। আবার অনেক উদ্ভিজ্জের বীজ দীর্ঘকাল পরে রোপণ করিলেও অঙ্কুর জন্মে। সচরাচর

দেখা যায়, যে সকল বীজের উপরের ত্বক দৃঢ়, তাহারা কোমলত্বক বীজ অপেক্ষা দীর্ঘকাল সজীব থাকে।

ক্ষেত্রের মৃত্তিকা কর্ষণাদি চাষের সমস্ত পাইট পূর্ব্বে সম্পন্ন করিয়া পরে বীজ রোপণ বা বপন করিতে হয়। অনন্তর ধূলার ন্যায় চূর্ণ মৃত্তিকার দ্বারা বীজ গুলিকে ঢাকিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কারণ তাহা হইলে, বায়ু প্রবেশের পথ রুদ্ধ হয় না, অথচ মৃত্তিকার অভ্যন্তরস্থ তাপ ও রস উদ্গত হইতে পারে না। ছোট ছোট বীজ অপেক্ষা বড় বড় বীজ একটু বেশী মাটির নীচে থাকিলেও হানি হয় না বটে, কিন্তু মৃত্তিকার অধিক নিম্নে কোন বীজই রোপণ করা উচিত নহে। বিশেষতঃ ক্ষুদ্রাকৃতির বীজ গুলির উপর মৃত্তিকার পাতলা আচ্ছাদন না থাকিলে তাহাদের অঙ্কুর অধিক মাটি ভেদ করিয়া উঠিতে সমর্থ হয় না। ধান্যাদি শস্যের বীজ বপন করিয়া যে একবার মৈ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে বীজের উপর মৃত্তিকা চাপা দেওয়াই তাহার উদ্দেশ্য।

বীজ রোপিত হইলে উপযুক্ত জল, বায়ু ও তাপ এই তিনের সাহায্যে অঙ্কুরিত হয়। বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার জন্য আলোকের সাহায্য আবশ্যক করে না, বরং আলোক অপেক্ষা অন্ধকারে অঙ্কুরোৎপাদন কার্য্য উত্তম রূপে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। কারণ অন্ধকারস্থ বীজকেই অপেক্ষাকৃত শীঘ্র অঙ্কুরিত হইতে দেখা

যায়। কিন্তু অঙ্কুর জন্মিবার পর আলোকের অভাব ঘটিলে, চারা শ্বেতবর্ণ ও অস্বাভাবিক দীর্ঘকায় হইয়া পড়ে।

রোপণের পর বীজমাত্রেই রসাকর্ষণ করিয়া স্ফীত-হয়। তৎপরে বীজের উপরের আবরণ ফাটিয়া অঙ্কুর বাহির হইয়া থাকে। অঙ্কুরের এক অংশ লম্বভাবে মৃত্তিকার মধ্যে প্রবেশ করে, আর এক অংশ বীজপত্র মস্তকে করিয়া উৰ্দ্ধগামী হয়। প্রথম অংশকে চারার মূল ও দ্বিতীয় অংশকে কাণ্ড বলে।

সকল প্রকার পুরাতন বীজ চূণের জলে তিন চারি ঘণ্টা ভিজাইয়া কিম্বা আগে শুধুজলে ভিজাইয়া পরে তাহাতে ঘুটের ছাই সংযোগপূৰ্ব্বক বপন বা রোপণ করিলে শীঘ্র অঙ্কুর জন্মে।

চারার মূল, কাণ্ড ও পত্রের কার্য্য।

পূৰ্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যে, বীজ হইতে অঙ্কুর জন্মিলে উহার যে অংশ লম্বভাবে মৃত্তিকা-মধ্যে প্রবেশ করে, তাহাকে চারার মূল কহে। চলিত কথায় মূলকে শিকড় বলে। মৃত্তিকা হইতে রসাকর্ষণপূৰ্ব্বক উদ্ভিজ্জদিগকে সজীব রাখাই মূলের প্রধান কার্য্য। এতদ্ভিন্ন উদ্ভিজ্জদিগকে মৃত্তি-

কার উপরে দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া রাখাও উহার আর এক কার্য্য। মৃত্তিকামধ্যে মূল প্রোথিত থাকে বলিয়া প্রবল ঝড় বাতাসে বৃক্ষকে সহসা উৎপাটিত করিতে পারে না।

উদ্ভিজ্জ দেহ পোষণ জন্য শিকড়গুলি মৃত্তিকার চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া খাদ্য অন্বেষণ করে। বড় ও সরু শিকড়গুলি রসাকর্ষণে অপটু, এনিমিত্ত তাহারা চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ না করিয়া বৃক্ষকে মৃত্তিকার উপরে দৃঢ়রূপে নিবদ্ধ রাখে এবং রসাকর্ষণার্থ ক্ষুদ্র শিকড়--গুলি চতুর্দ্দিকে ধাবিত হয়। শিকড়ের সকল অংশে রস শোষিত হয় না। উহাদের অগ্রভাগের নবীন-তম অংশই রস আকর্ষণে সমর্থ। পুরাতন শিকড় হইতে যে সূত্রবৎ শিকড় বহির্গত হয়, তাহাদেরও ঐ শক্তি আছে।

চারা বড় হইয়া উঠিলে শিকড়গুলি গোড়া হইতে দূরে গিয়া পড়ে। তখন জল সিঞ্চন ও সারপ্রদান, বৃক্ষের কেবল গোড়ায় করিলে কোন ফল দর্শে না। কারণ শিকড়ের অগ্রভাগস্থ কোমল নবীন অংশের সম্মুখে না পৌছিলে শিকড়গুলি সেই রস গ্রহণে সমর্থ হয় না। উদ্ভিজ্জবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতগণ বলেন, বৃক্ষের কাণ্ডের উপরে শাখা প্রশাখা যতদূর ব্যাপ্ত হয় সচরাচর শিকড়গুলি বৃক্ষের গোড়া হইতে ততদূর

পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া থাকে। কখন কখন বা তদপেক্ষাও দূরে যায়। কিন্তু কোন কোন উদ্ভিজ্জের শিকড় চারিপাশে না ছড়াইয়া গভীর মৃত্তিকামধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। মূলের কার্য্য সকল সময়ে সমান থাকে না। প্রবল শীতের সময় মূলগুলি অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ থাকে, বসন্তের প্রারম্ভেই শীতের জড়তা দূরীভূত হইয়া পুনরায় প্রখরতা লাভ করে।

শাখা এবং মূল এই দুই সীমার মধ্যস্থ অংশকেই সচরাচর কাণ্ড বলে। কাণ্ডে কাষ্ঠের সঞ্চার হইয়া দৃঢ় হইলে দৃঢ়কাণ্ড এবং কাষ্ঠের অভাবে কোমল থাকিলে কোমলকাণ্ড উদ্ভিদ কহে। আম্রাদি বৃক্ষ দৃঢ়কাণ্ডের এবং লাউ, কুমড়া প্রভৃতি লতা ও আলু, মূলা প্রভৃতি সব্জি কোমল কাণ্ড উদ্ভিদের উদাহরণ। কোমল কাণ্ড অপেক্ষা দৃঢ়কাণ্ড উদ্ভিদ দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে।

আলু, মূলা, শালগাম প্রভৃতির কোমল কাণ্ড মৃত্তিকার উপরে থাকিলে, দারুণ শীতের প্রভাবে নির্জ্জীব হইয়া পড়ে, মৃত্তিকার অভ্যন্তরে থাকায় শীতের অপকারিতা হইতে প্রকৃতিই উহাদিগকে রক্ষা করেন। ঐ সকল উদ্ভিদের কাণ্ড কোনরূপে মৃত্তিকার বাহির হইয়া পড়িলে মৃত্তিকাদ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া উচিত, তাহা হইলে উহারা নির্ব্বিঘ্নে বৃদ্ধি পায়।

উদ্ভিদ মাত্রেরই কাণ্ড, ত্বক অর্থাৎ ছালে আচ্ছাদিত। ত্বক আছে বলিয়া কাণ্ডে সহসা আঘাত লাগিতে পারে না। উদ্ভিজ্জের পুষ্টিসাধন বিষয়েও ত্বক অনেক সাহায্য করে। যদি কোন প্রকারে চারার ত্বকের বিশেষ অপচয় হয়, তাহা হইলে চারা নিস্তেজ হইয়া পড়ে ও শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায়।

পত্র উদ্ভিজ্জদিগের শ্বাসযন্ত্র স্বরূপ, অর্থাৎ পত্র দ্বারা উদ্ভিজ্জদিগের শ্বাসক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়। উদ্ভিজ্জ দেহ পোষণোপযোগী রস প্রস্তুত করাও পত্রের কার্য্য। কিন্তু অপক্ক রস পরিশোধনে আলোকের সাহায্য অত্যন্ত প্রয়োজন। আলোকাভাবে উদ্ভিজ্জগণ অধিক কোমল, রসাল ও শ্বেতবর্ণ হইয়া পড়ে। সুতরাং তাহাতে তাহারা যথানিয়মে ফল পুষ্প প্রসবে সমর্থ হয় না। এই জন্যই আওতা অর্থাৎ ছায়াবিশিষ্ট স্থানে অধিকাংশ উদ্ভিদ বিকৃত হইয়া যায়।

যদি কোন কারণে কোন বৃক্ষের সমুদায় পত্র একেবারে বিনষ্ট বা বিকৃত হয়, তাহা হইলে উপরিউক্ত কার্য্যগুলির অভাবে বৃক্ষের নিশ্চয়ই হানি হইবে। শরৎ বা শীতকালে স্বভাবতঃই অনেক বৃক্ষের সমুদায় পত্র একেবারে পতিত হয়; কিন্তু তাহাদের পত্র পতনের অব্যবহিত পূর্ব্বেই নবীন পত্রমুকুল উদ্গত হইয়া থাকে। শজিনা, কুল প্রভৃতি কতকগুলি বৃক্ষের ফল

ফুরাইয়া গেলে লোকে তাহাদের সমুদায় শাখা ছেদন করিয়া ফেলে। শাখা ছেদনের পর ঐ সকল বৃক্ষ কয়েকদিন সুপ্ত অবস্থায় থাকিয়া প্রচুর পত্রকলিকা প্রসব করে এবং সেই সকল পত্র কলিকাজাত নবীন শাখা প্রশাখাতেই পর বৎসর যথেষ্ট ফল ধরে। পত্র যত পুরাতন হয়, ততই স্বকার্য্য সাধনে অক্ষম হইয়া পড়ে। নূতন পত্রসকলই অধিকতর কার্য্যক্ষম। শাখা প্রশাখার অগ্রভাগস্থ নবীন কোমল অংশেও কিয়ৎপরিমাণে পত্রের কার্য্য হইয়া থাকে।

চারা রোপণ।

বর্ষার আরম্ভ বা শরৎকাল, ফলফুল প্রভৃতি বৃক্ষের চারা এক স্থান হইতে তুলিয়া অন্য স্থানে রোপণ করিবার উপযুক্ত সময়। কারণ এ সময়ে মূলের রস-পরিশোষণ শক্তি অপেক্ষাকৃত কম থাকে, সুতরাং ঐ শক্তি প্রখর হইবার পূর্ব্বেই স্থানান্তর জন্য উহার যাবতীয় ক্লেশ দূর হইয়া যায়। শীতের পর বসন্ত কালেও মূলের শক্তি বৃদ্ধি হয় সত্য, কিন্তু প্রবল শীতের সময় চারাগুলির যেরূপ শীর্ণাবস্থা ঘটে, সে অবস্থায় স্থানপরিবর্ত্তনের ক্লেশ সহ্য হয় না। এজন্য শীতকালে এক স্থান হইতে চারা

তুলিয়া অন্য স্থানে রোপণ করা উচিত নহে। বড় বড় বৃক্ষের চারা বর্ষাকালে রোপণ করিলে ক্ষতি হয় না। কারণ বৃষ্টির জল সেই সকল চারাকে জীবিত রাখার পক্ষে সাহায্যকারী হইয়া থাকে।

শিকড়ের বিস্তৃতি বুঝিয়া গোড়ার কতক দূরের মৃত্তিকাসমেত চারা উঠান কর্ত্তব্য; তাহা হইলে শিকড়ে আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা থাকে না। যে সকল উদ্ভিজ্জের কাণ্ড মৃত্তিকার উপরে থাকিয়া বৃদ্ধি পায়, তাহাদের চারা রোপণ সময়ে এরূপ সাবধান হইতে হইবে, যেন মূলের সীমা অতিক্রম করিয়া কাণ্ড মৃত্তিকাগর্ত্তে প্রোথিত না হয়। শাকসবজি প্রভৃতি ক্ষুদ্র জাতীয় উদ্ভিজ্জের চারা তুলিয়া রোপণ করা অনায়াসসাধ্য। প্রখর রৌদ্রের সময় ঐ কাজ করা উচিত নহে। নূতন স্থানে চারা রোপণ করিয়া যাবৎ সেই স্থানের মৃত্তিকায় শিকড় না লাগিবে, তাবৎ প্রতিদিন বৈকালে জলসেচন করা কর্ত্তব্য।

বৃক্ষের পূর্ণাবস্থায়, শাখা প্রশাখা ও শিকড় যত দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে, তাহা স্মরণ করিয়া উপযুক্ত অন্তরে অন্তরে চারা রোপণ করিবে। চারা ঘন ঘন রোপিত হইলে, পূর্ণাবস্থার সময় পরস্পরের শাখায় শাখায় ও মূলে মূলে সংস্পৃষ্ট হইয়া নিপী-

ড়িত হয়। তাহাতে ভালরূপ ফল ফুল জন্মিতে পারে না। আম্রাদি বৃহৎ বৃক্ষের চারা পরস্পর কুড়ি হাত অন্তরে রোপণ করা উচিত; মধ্যমাকৃতি বৃক্ষের চারা ষোল হাত অন্তরে এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জাতীয় বৃক্ষের চারা দশ বার হাত অন্তরে রোপণ করিলে ঐ অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে না।

চাষের নিয়ম।

মৃত্তিকা কর্ষণকেই চাষ বলে। আলগা মাটি না পাইলে, উদ্ভিজ্জদিগের শিকড় মৃত্তিকামধ্যে বিস্তৃত হইয়া রসগ্রহণে সমর্থ হয় না এবং কর্ষণ ভিন্ন মৃত্তিকার উর্ব্বরতা শক্তিও প্রকাশ পায় না। অতএব ক্ষেত্রের চাষ ভালরূপ হওয়া আবশ্যক। মৃত্তিকার অবস্থা ও শস্যের প্রকৃতি অনুসারে ক্ষেত্রে কখন অল্প কখন বা অধিক চাষের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

ভূমিতে চাষ দেওয়ার জন্য লাঙ্গলই প্রধান যন্ত্র। কোদাল দ্বারাও মৃত্তিকা খনন করা যায় বটে, কিন্তু বিস্তৃত শস্যক্ষেত্রাদির চাষে কোদাল উপযোগী নহে। চাষের জন্য কোদাল প্রশস্ত উপায় নয় বলিয়া, কৃষকেরা বলিয়া থাকে, "ধর্ম্মের জন্য উপাস আর কোদাল পেড়ে চাষ" সমান।

আমাদের দেশীয় লাঙ্গল অপেক্ষা বিলাতী লাঙ্গলে অল্প সময়ে অধিক ভূমির চাষ হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও বর্ত্তমান অবস্থায় বিলাতী লাঙ্গল আমাদের দেশের উপযোগী নহে। বিলাতী চক্র-যুক্ত লাঙ্গল সমতল ভূমি ভিন্ন কূর্ম্মপৃষ্ঠ ও ক্রমনিম্ন ক্ষেত্রে চালান যায় না এবং ঐ লাঙ্গলের মূল্য বেশী, ও দুর্ব্বল গরুতে উহা টানিয়া উঠিতে পারে না। এ দেশের সমস্ত ক্ষেত্র সমতল নহে এবং এদেশের কৃষকেরা দরিদ্র ও গরুগুলিও তাদৃশ বলবান নহে; এই সকল কারণে বিলাতী লাঙ্গল অধিক কার্য্যকারী হইলেও বর্ত্তমান সময়ে উহা এদেশের পক্ষে অনু-পযোগী। দেশীয় গরুর মধ্যে যে গুলি বলবান, তাহাদের দ্বারা দেশীয় এক লাঙ্গলে এক দিনে দুই বিঘা জমির চাষ হইতে পারে, কিন্তু দুর্ব্বল গরু হইলে, এক দিনে পোনের কাঠা বা এক বিঘার বেশী জমি চাষ হয় না।

সুযোগ ঘটিলেই ভূমিতে চাষ দিতে হয়। চাষের সুযোগকে কৃষকেরা 'যো' কহিয়া থাকে। বৃষ্টির পর জল টানিয়া যখন মাটির অবস্থা এরূপ হয় যে, ক্ষেত্রে বেড়াইলে পায়ের তলায় কাদার দাগ লাগে না, অথচ মাটি সরস থাকে; চাষের পক্ষে তাহাই সুযোগ তাহাকেই 'যো' বলে। এই অবস্থায় ক্ষেত্রে লাঙ্গল

চালাইলে, লাঙ্গলে কাদা জড়াইয়া লাগে না, অথচ মাটির মধ্যে লাঙ্গলের ফাল অধিক দূর প্রবেশ করে। সুতরাং কর্ষণক্রিয়া সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হয়। এ জন্য কৃষকেরা বলে "যা করে না শতেক পোয়ে, তা করে এক যোয়ে" অর্থাৎ যো থাকিতে চাষ দিলে অল্প আয়াসে যে কার্য্য হয়, যো সরিয়া গেলে শত লোক লাগাইলেও সে কাজ করা যায় না।

বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসে যে সকল ফসলের বীজ বপন করিতে হইবে, মাঘ বা ফাল্গুন মাসে বৃষ্টি হইলে 'যো' বুঝিয়া তাহাদের ক্ষেত্রে প্রথম চাষ দিবে এবং তৎপরে বীজবপনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যতবার 'যো' পাইবে, ততবারই চাষ দিতে হইবে। ইহাতে ক্ষেত্রে অনেকবার চাষ দেওয়ার আবশ্যক হইলেও ব্যয় ও পরিশ্রমাধিক্য জন্য ক্ষতি মনে করিও না। কারণ চাষের সংখ্যা যত বেশী হয়, ফসলও তত ভাল হইয়া থাকে। এ দেশে এই চাষ, বৈশাখী চাষ নামে প্রসিদ্ধ। বৈশাখী চাষে অনেক প্রকার ধান্য, পাট, ইক্ষু প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বর্ষা অন্তে অর্থাৎ আশ্বিন বা কার্ত্তিক মাসে জমিতে চাষ দিয়া যব, গম, কড়াই, মুসুরী, ছোলা, মটর প্রভৃতি শস্য ও আলু, মূলা, কপি, প্রভৃতি নানা প্রকার শাক সব্জির বীজ ছড়ান হইয়া থাকে, এই

চাষকে কার্ত্তিকে চাষ বলে। উঠিত জমিতে দুই তিন বার চাষ দেওয়ার পরই বীজবপন চলিতে পারে।

তৃণাচ্ছাদিত পতিত জমিতে চাষ দিতে হইলে 'যো'র অপেক্ষা করিবার আবশ্যক নাই। অধিক পরিমাণে বৃষ্টি বর্ষণের পর মৃত্তিকা সম্পূর্ণরূপে জলঃসিক্ত থাকিতে থাকিতেই চাষ দিতে হয়। এই অবস্থায় পুনঃ পুনঃ লাঙ্গল ও মৈ দিলে, তৃণগুলি সমূলে উৎপাটিত হইয়া মৃত্তিকার সহিত উলট পালট হয় এবং ক্রমে পচিয়া গিয়া মৃত্তিকাবৎ হইয়া উঠে, তাহাতে ক্ষেত্র অতিশয় উর্ব্বরা হয়। এই চাষকে পচান চাষ বলে। পচান চাষের পর 'যো' বুঝিয়া কয়েক বার চাষ দিলেই পতিত জমি উঠিত হইয়া শস্যাদি জন্মিবার উপযুক্ত হয়।

বিলান ক্ষেত্র বর্ষার জলে মগ্ন হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে তাহার চাষ আবাদ সমাপ্ত করিতে হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে ধান ভিন্ন অন্য শস্য জন্মে না। যদি কার্ত্তিক মাসে জল টানিয়া যায়, তাহা হইলে কোন কোন বিলে রবিফসল জন্মান যাইতে পারে।

পলিপড়া জমিতে অধিক চাষ দেওয়ার আবশ্যক হয় না। কারণ উহার মৃত্তিকা স্বভাবতঃই কোমল ও আলগা।

লাঙ্গল দেওয়ার পর মৈ টানিলে, কর্ষিত মৃত্তিকার ডেলাগুলি ভাঙ্গিয়া গুড়া হয় এবং ক্ষেত্রের পৃষ্ঠ সমতল ভাব ধারণ করে। মাটি খোঁড়া, ডেলা ভাঙ্গা, জঙ্গলাদি বাছিয়া ফেলা এবং মৈ টানিয়া ক্ষেত্রপৃষ্ঠ সমতল করা প্রভৃতি কার্য্যকে ক্ষেত্রের পাইট বলে। জমি অগ্রে পাইট না করিয়া যাঁহারা বীজ বপনের সম সম কালে পাইট আরম্ভ করেন, ব্যস্ততা প্রযুক্ত তাঁহাদের জমি ভালরূপ প্রস্তুত হয় না।

ক্ষেত্রের অবস্থা অনুসারে যেমন তাহাতে অধিক বা অল্প চাষ দেওয়ার প্রয়োজন হয়, ফসলের প্রকৃতি বিশেষেও সেইরূপ অধিক বা অল্প চাষের প্রয়োজন হইয়া থাকে। কোন্ প্রকার ফসলের জন্য কিরূপ চাষের আবশ্যক, নিম্নলিখিত প্রবাদবাক্যে কৃষকেরা তাহা প্রকাশ করিয়া থাকে।

"শতেক চাষে মুল,
তার অর্দ্ধেক তুল,
তার অর্দ্ধেক ধান,
বিনা চাষে পান।"

এই প্রবাদের তাৎপর্য্য এই, মূল অর্থাৎ যাহাদের কাণ্ড মৃত্তিকার অভ্যন্তরে থাকিয়া বৃদ্ধি পায়, যেমন আলু, কচু, ওল, মূলা ইত্যাদি, ইহাদের জন্য ক্ষেত্রে অধিক চাষ দেওয়া আবশ্যক। তুল অর্থাৎ কার্পাস,

পাট, শণ প্রভৃতি সূত্রোৎপাদক উদ্ভিদের চাষে উহা অপেক্ষা কম চাষের প্রয়োজন ; ধান অর্থাৎ ধান্যাদি শস্যের জন্য, তুল জাতীয় উদ্ভিদ অপেক্ষা কম চাষের আবশ্যক। পান অর্থাৎ লতাজাতীয় উদ্ভিদের জন্য জমিতে চাষ দেওয়ার প্রায় আবশ্যক হয় না। সুতরাং প্রায় সর্ব্বপ্রকার উদ্ভিজ্জের চাষের বিধান এই প্রবাদ বাক্যে প্রকাশিত রহিয়াছে। কেহ কেহ এই প্রবাদ বাক্যের অর্থ করিবার সময় মূলা, তুলা, ধান ও পান, মাত্র এই চারিটি উদ্ভিদের নাম উল্লেখ করেন। কিন্তু উপরের ব্যাপক অর্থ পরিত্যাগ করিয়া, এই সঙ্কীর্ণ অর্থ গ্রহণ করা সঙ্গত বলিয়া বোধ করি না।

সার।

সার, কৃষিকার্য্যে অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ। উদ্ভিজ্জগণের পুষ্টিসাধন জন্য যে সকল দ্রব্যের আবশ্যক, মৃত্তিকায় সেই সকল পদার্থের অভাব ঘটিলেই সার দিতে হয়, নতুবা উদ্ভিজ্জগণ সতেজ থাকিতে পারে না। জীব জন্তুর মলমূত্র, গলিত উদ্ভিদ ও জীবশরীর, অস্থিচূর্ণ, বোদমাটি, খৈল প্রভৃতি পদার্থগুলি সচরাচর সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

তাহার কারণ এই যে, এই গুলিতে প্রায় সমস্ত উদ্ভিজ্জেরই দেহ পোষণোপযোগী পুষ্টিকর পদার্থ বিদ্যমান আছে। চূণে কঠিন মৃত্তিকাকে শিথিল করে ও জঙ্গল নষ্ট করে। এটেল মাটিতে চূণ ছড়াইলে উপকার হয়, কিন্তু বীজ ও চারা রোপণের অনেক পূর্ব্বে ক্ষেত্রে চূণ ছড়াইতে হয়, নতুবা চূণের ঝাঁজে গাছ মরিয়া যায়।

সার সংযোগে মৃত্তিকার উর্ব্বরতা শক্তি অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয় বটে, কিন্তু ঐ সার পরিমাণাতিরিক্ত হইলে অনেক উদ্ভিদ অসম্ভব স্থূলশরীর হইয়া ফল ফুল প্রসবে বিরত থাকে এরূপও দেখা যায়। অতএব অধিক লাভের আশায় শস্যক্ষেত্রে বা ফলের বাগানে অত্যধিক সার ছড়ান উচিত নহে। কপি, পালং, মুলা, আলু প্রভৃতির দেহ ও পত্রই আমাদের খাদ্য, এজন্য এই সকলের ক্ষেত্রে অধিক সার ছড়াইলে ক্ষতি হয় না। উদ্ভিজ্জের প্রকৃতি মৃত্তিকার অবস্থা বুঝিয়া সারের পরিমাণ ঠিক করিতে হয়, এজন্য বিঘা প্রতি কোন্ সার কি পরিমাণ আবশ্যক, তাহা নিশ্চয় বলা যায় না।

উদ্ভিজ্জ সার।

বৃক্ষের শাখা, পত্র প্রভৃতি পচিয়া অতি তেজস্কর সার হয়। এই সার সর্ব্ব প্রকার কৃষিকার্য্যেই ব্যব-

হৃত হইতে পারে। বিশেষতঃ শাকসবজি ও শস্য-ক্ষেত্রের পক্ষে ইহা বড় উপকারী। এই সার প্রস্তুত করিতে হইলে লতা, পাতা, ডাল প্রভৃতি একত্র করিয়া অল্পজলবিশিষ্ট কোন গর্ত্ত বা ডোবায় ফেলিয়া রাখিবে। তথায় বৎসরাবধি পচিলে, ঐ সকল সার রূপে পরিণত হইবে। কিন্তু অধিক জল থাকিলে শীঘ্র পচিবে না। এই সার প্রতিবিঘায় ১৫ হইতে ৩৫ মণ পর্য্যন্ত দেওয়া যায়। বৃক্ষের শাখাপত্রাদি দগ্ধ করিলে যে ছাই হয়, তাহা কোন কোন উদ্ভিজ্জের পক্ষে উপকারী। ছাই সারে মানকচু অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ইহা ধান্য ও তামাকের পক্ষেও ভাল। নীল-কুঠীর চৌবাচ্চায় যে সিটা পাওয়া যায়, তাহা উৎকৃষ্ট সার।

খৈলও এক প্রকার উদ্ভিজ্জ সার। ইহা অনেক প্রকার শাকসবজি ও ফলবৃক্ষের পক্ষে উত্তম। ইক্ষু, পাট, কার্পাস, আলু, কপি প্রভৃতির পক্ষে খৈল বিশেষ উপকারী। প্রতি বিঘায় একমণ বা সোয়া-মণ খৈল দেওয়া যায়। খৈল ছড়াইতে হইলে প্রথমতঃ গুড়া করিবে, পরে সেই গুড়া চাষ দেওয়া জমিতে ছড়াইয়া পুনর্ব্বার এরূপে চাষ দিবে যে, খৈল চাপামাত্র পড়ে। এই সময়ে জল সেচন পূর্ব্বক মাটি ভিজাইয়া দিবে। ইহারপর কয়েকদিন

অপেক্ষা করিয়া ক্ষেত্রে চারা বা বীজ বপন্ করিবে। চারা বড় হইলে, আর একবার খৈল দেওয়া আবশ্যক। সর্ষপ, মসিনা, তিল, রেড়ি প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার খৈলই উৎকৃষ্ট সার। খৈল সারে উদ্ভিজ্জ সমূহের ফল বড় হইয়া থাকে।

প্রাণি-সার।

প্রাণিদিগের চর্ম্ম, মাংস, শোণিত, অস্থি, শৃঙ্গ, নখ প্রভৃতি পচিয়া উত্তম সার প্রস্তুত হয়। এই সার প্রস্তুত করিতে হইলে, মৃত জন্তুর শরীর মৃত্তিকা গর্ত্তে ফেলিয়া তদুপরি চূণ ছড়াইয়া দিবে। পরে উপরে মাটি চাপা দিয়া দুই তিন মাস তদবস্থায় রাখিবে। অনন্তর তাহা তুলিয়া দুর্গন্ধ নিবারণ জন্য পুনর্ব্বার চূণ মিশাইয়া কর্ষিত ক্ষেত্রে ছড়াইবে।

প্রাণিদিগের অস্থি চূর্ণ ক্ষেত্রে ছড়াইলে, অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময় পর্য্যন্ত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি প্রবল থাকে। কিন্তু অস্থি গুলিকে অত্যন্ত চূর্ণ করা হইলে, প্রথম বৎসরেই অত্যন্ত উপকার পাওয়া যায়, তৎপরে উহার আর তাদৃশ তেজ থাকে না। অতএব অস্থি চূর্ণ করিবার সময় অত্যন্ত সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত না করিয়া কিছু স্থূল স্থূল খণ্ড রাখা কর্ত্তব্য। ইহার

সংযোগে মৃত্তিকা অত্যন্ত আল্‌গা হয়। শৃঙ্গের গুড়া অস্থিচূর্ণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। যে ক্ষেত্রের মৃত্তিকা স্বভাবতঃ আল্‌গা ও উত্তাপিত, প্রাণি-সার তাহার পক্ষেই বিশেষ উপকারী; কিন্তু যে ক্ষেত্রে এটেল মৃত্তিকার ভাগ বেশী, তাহাতে এই সার অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে না দিলে উপকার দর্শে না।

মিশ্র-সার।

নানাবিধ সার পরস্পর মিশ্রিত হইয়া যে সার হয়, তাহাকে মিশ্রসার কহে। মনুষ্য, গো, অশ্ব, মেষ, মহিষ, শূকর, গর্দ্দভ, কপোত, কুক্কুট প্রভৃতি প্রাণিদিগের বিষ্ঠা উত্তম মিশ্রসারের মধ্যে গণ্য। মনুষ্য বিষ্ঠা উত্তম সার হইলেও এদেশে উহা ব্যবহার হয় না। গোময় ও অশ্ব বিষ্ঠাই অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু টাট্‌কা অবস্থায় উহা কৃষিকার্য্যের উপযোগী নহে। কোন ছায়া-বিশিষ্ট স্থানে গর্ত্ত করিয়া সেই গর্ত্ত, গো বা অশ্ব বিষ্ঠাদ্বারা পূর্ণ করিবে এবং মধ্যে মধ্যে তাহাতে গোমূত্র ঢালিবে। গর্ত্তের এক ধারে আর একটী অপেক্ষাকৃত নিম্ন গর্ত্ত করিয়া তাহা প্রথম গর্ত্তের সহিত সংলগ্ন রাখিবে, তাহা হইলে প্রথম গর্ত্ত হইতে

গোময়াদি পচিয়া তাহার রস দ্বিতীয় গর্ত্তে সঞ্চিত হইবে, ঐ সঞ্চিত রস তুলিয়া ক্ষেত্রে ছড়াইলে ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। গোবরাদি পচিয়া পরে শুষ্ক হইয়া মাটির মত হইলে, তাহাও সার রূপে ব্যবহৃত হয়। এইরূপ শুষ্কসার প্রতি বিঘায় ১৫ মণ হইতে ২০ মণ পর্য্যন্ত দেওয়া যায়। মেষ, ছাগ, ও শূকর বিষ্ঠার শুষ্কসার প্রতি বিঘায় তিন চারি মণ লাগে।

তরল সার ক্ষেত্রে ছড়াইবার পূর্ব্বে ভূমি চযিয়া মৃত্তিকা চূর্ণ করতঃ মৈ টানিবে। কারণ ক্ষেত্রের মৃত্তিকা সমান না করিলে, তরলতা প্রযুক্ত ইহা উচ্চ-স্থান হইতে গড়াইয়া নিম্ন স্থানে সঞ্চিত হইবে; সুতরাং তাহাতে ক্ষেত্রের সর্ব্বস্থানের উপকার সাধিত হইবে না। গামলায় যেসকল চারা জন্মান যায়, তাহাদের মূলে এই সার প্রদান করিলে তাহারা শীঘ্র বর্দ্ধিত হইয়া উঠে।

গোমূত্র পচাইয়া তাহাতে খৈলের গুড়া মিশ্রিত করিলে একপ্রকার উৎকৃষ্ট মিশ্রিত সার প্রস্তুত হয়; তদ্দ্বারা মৃত্তিকার উর্ব্বরতা শক্তির বিলক্ষণ প্রাখর্য্য জন্মে। গোমূত্রের ন্যায় ঘোটক গর্দ্দভ মেষ মহিষাদির মূত্রও কৃষি কার্য্যে উপকারী; কিন্তু সদ্য মূত্রের তেজ দুঃসহ। তাহা চারার মূলে প্রদান

করিলে চারা দগ্ধপ্রায় হইয়া যায়; এজন্য উহা কলসে করিয়া কিছুদিন পচাইতে হয়। কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের কঠিন সারের সহিত তাহার তিনগুণ জল মিশ্রিত করিয়া কিছুদিন রাখিলে তাহাতে গেঁজা (বুদ্ বুদ্) উঠিয়া যখন সেই গেঁজা পুনঃ মিশিয়া যাইবে, তখন একরূপ তরলসার প্রস্তুত হয়। পচা গোময়, গাছের পচাপাতা, নদী তীরের বালি এবং সামান্য মৃত্তিকা এই চারি দ্রব্য সমান ভাগে মিশ্রিত করিয়া যে সার হয়, সেই সারে অধিকাংশ ফুলের গাছ অতিশয় তেজাল হয়। কুক্কুট ও পারাবত জাতীয় পক্ষিদিগের আবাস স্থান হইতে তাহাদের বিষ্ঠা লইয়া যে সার প্রস্তুত হয়, পুষ্পোদ্যানের পক্ষে তাহা বিশেষ উপকারী।

খনিজ সার।

খনিজ সারের মধ্যে চূণ ও লবণ এদেশে কিয়ৎ পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চূণে কঠিন মৃত্তিকাকে কোমল করে এবং ক্ষেত্রের আগাছা নষ্ট করে। ইহা এটেল মৃত্তিকাবিশিষ্ট ক্ষেত্রেই ভাল। বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্থানের মৃত্তিকায় বালির ভাগ বেশী থাকায় অতি অল্প স্থানেই ইহা আবশ্যক হয়।

এটেল মৃত্তিকার ক্ষেত্রে প্রতি বিঘায় দশ বার সের চূণ দেওয়া যাইতে পারে। গুড়া চূণ সারের জন্য আবশ্যক। লবণ সারও এদেশের মৃত্তিকার পক্ষে বড় প্রয়োজন হয় না; কারণ স্বভাবতঃই এ দেশের মৃত্তিকায় লবণ মিশ্রিত আছে। মৃত্তিকায় লবণের ভাগ বেশী হইলে ক্ষেত্র অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। বীট-পালঙ্গাদি সামুদ্রিক উদ্ভিজ্জের পক্ষে লবণসার ভাল। ঐরূপ সব্জির ক্ষেত্রে প্রতি বিঘায় ছয় সাত সের লবণ ছড়াইলেই যথেষ্ট হয়।

জলসিঞ্চন।

জল উদ্ভিজ্জের জীবন স্বরূপ; জলহীন স্থানে উদ্ভিজ্জ সমূহ জন্মিতে পারে না। উষ্ণ দেশের অনেক বালুকাময় ক্ষেত্রে বর্ষাকালে বহুল উদ্ভিজ্জ জন্মিতে দেখা যায়, কিন্তু বর্ষান্তে ভূমি নীরস হইলেই ক্ষেত্র মরুভূমির আকার ধারণ করে। ভারতবর্ষ দেবমাতৃক দেশ; এদেশের কৃষকদিগের বৃষ্টির জলের প্রতি অধিক নির্ভর। যে বৎসর আবশ্যক মত বৃষ্টি হয়, সে বৎসর কৃষিকার্য্যও সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। বৃষ্টির অভাব ঘটিলে বা অতি বৃষ্টি হইলে এদেশে কৃষির বিলক্ষণ ব্যাঘাত ঘটে; কারণ

এদেশের কৃষকেরা জলসিঞ্চনের ভাল বন্দোবস্ত করে না অথবা অতিরিক্ত জল নির্গমনের উপায় রাখে না। এজন্য শুকার সময় বা পূর্ণ বর্ষার সময় অনেক শস্য ও ফলপুষ্পাদি বৃক্ষের হানি হইয়া থাকে।

শস্যক্ষেত্রেই প্রচুর জলের আবশ্যক। জলদ্বারা ক্ষেত্রকে প্লাবিত করিতে পারা যায়, শস্যক্ষেত্রের পক্ষে তদ্রূপ ব্যবস্থা রাখিতে হয়। পুষ্করিণী বা খালের বাঁদ কাটিয়া কিম্বা ডোঙ্গাকল বা সিউনী দ্বারা জল তুলিয়া এদেশে শস্যক্ষেত্র প্লাবিত করা হইয়া থাকে। ফল ফুলের উদ্যানে তাদৃশ জলের প্রয়োজন হয় না। তোলা জল সিঞ্চন দ্বারাই উদ্যানের জলের আবশ্যকতা পূর্ণ হয়। কিন্তু উদ্যানের জলসিঞ্চনে বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন; প্রবল ধারায় জল দিলে, চারার মূলে গর্ত্ত হইয়া তাহাকে বিনষ্ট করিয়া ফেলে। এজন্য ফল বা পুষ্পের চারার মূলে বোমা অথবা তাদৃশ সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট পাত্র জলপূর্ণ করিয়া ক্ষীণ ধারায় জলসেচন কর্ত্তব্য। বীজ বপনের পর অধিক জল সেচন করা উচিত নহে। কারণ অধিক জলসেচন করিলে বীজ অধিক মাটির নীচে যায়, অথবা বীজের উপরিস্থ মৃত্তিকা ধৌত হইয়া বীজ বাহির হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ জলের পরিমাণ অধিক হইলে অনেক বীজ পচিয়া যায়। বীজে

অঙ্কুর জন্মিলে এবং শিকড় বহির্গত হইলে, সেই সকল শিকড় যেমন অল্পে অল্পে মাটির নীচে প্রবেশ করে, সেইরূপ হিসাবে অর্থাৎ অল্প অল্প মাটি ভিজিবার উপযুক্ত জল দিতে হয়। পুনশ্চ ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, জল না পাইলেও বীজ শুষ্ক হইয়া অঙ্কুরোৎপাদনে অক্ষম হয়।

গামলায় বা টবে বীজ বপন করিলে, তাহাতে দুর্ব্বার আটি ভিজাইয়া জলের ছিটা দেওয়া উত্তম। অঙ্কুর না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ গমলা বা টবের উপরে উলু খড় বিছাইয়া তদুপরি বোমার দ্বারা সূক্ষ্ম ধারায় জলসেচন করিলে বীজের উপরিস্থ মৃত্তিকা ধৌত হইতে পারে না কিম্বা বীজ অধিক মাটির নীচে যাইতে পারে না। এই প্রক্রিয়ার আর একটী গুণ এই যে, খড় চাপা থাকায় আলোক প্রাপ্তির ব্যাঘাত ঘটে তাহাতে অন্ধকারে অঙ্কুরোৎপাদন ক্রিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে সম্পান্ন হইয়া থাকে। অধিকাংশ ফুলের-চারা উৎপন্নের জন্য এই নিয়ম ভাল।

উদ্যানস্থ আম, কাঁটাল, নিচু প্রভৃতি বৃহৎ বৃক্ষের মূলে আলবাল প্রস্তুত করিয়া জল সেচন করিবে। অপরাহ্ণে জলসেচন করাই উচিত। রৌদ্রের সময় জল দিলে চারার অপকার হয়। গ্রীষ্মকালে প্রতি দিবস প্রাতে ও অপরাহ্ণে জলসেচন করিবে। বর্ষার

জলে যখন চারার মূলস্থ মৃত্তিকা সরস থাকে, তখন জলসেচনের আবশ্যক হয় না। ফলতঃ বৃক্ষ ও ঋতুর অবস্থা বুঝিয়া জল সেচন করাই কর্ত্তব্য। জল উদ্ভিজ্জের অত্যন্ত আবশ্যকীয় হইলেও অতিরিক্ত জলে হানি হইয়া থাকে। সন্ধ্যাকালের একবারের জলসেচন প্রাতঃকালের দুই বারের সমান; কারণ প্রাতঃকালে জল দিলে তাহার অনেক বাষ্প হইয়া যায়, সন্ধ্যাকালের জল খুব কম বাষ্প হয়।

বৃষ্টির জল ভিন্ন, সিঞ্চিত জলদ্বারা শস্যক্ষেত্রের কার্য্য চালান কঠিন। অনাবৃষ্টির বৎসর কৃষকেরা উৎপন্ন শস্য রক্ষা করিবার জন্য ধান্যাদির ক্ষেত্রে জলসিঞ্চন করে বটে, কিন্তু তাহাতেও ষোলআনা রক্ষা হয় না। প্রকৃতির উপর কাহারও কর্তৃত্ব নাই। কৃষকের যখন আবশ্যক হইবে, তখনই বৃষ্টি হয় না। সুতরাং বৃষ্টির অনুসরণ করিয়া কৃষককেই চলিতে হয়; তবে বৃষ্টি হওয়ার লক্ষণ পূর্ব্বে জানিতে পারিলে, কৃষি কার্য্যের অনেক সুবিধা হইতে পারে। বৃষ্টির সম্ভাবনা সম্বন্ধে কৃষকদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রবাদ বাক্য চলিত আছে।

"কোদালে কুড়ুলে মেঘের গা,
এলো মেলো বহে বা;
শশুরকে বল বাস্তে আল,
আজ না হয় হবে কাল।

ইহার অর্থ এই, যখন দেখিবে কোদালে কাটা মাটির মত আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ দেখা দিয়াছে, বাতাসও নানাদিক হইতে এলো মেলো বহিতেছে, তখনই জানিবে আজ কালের মধ্যে বৃষ্টি হইবে। আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, কৃষকদিগের এই প্রবাদ অনেক সময়ে সত্য হয়।

সংবৎসরের বৃষ্টির অবস্থা জানিবার জন্য নিম্ন-লিখিত কৃষিপ্রবাদ চলিত আছে।

"আষাঢ় নবমী শুকুল পাখা,
কি কর শ্বশুর লেখা যোখা,
যদি বর্ষে কণা, পর্ব্বতে নামে কাল্‌নামনা,
যদি বর্ষে ঠায়, মেল মন্দার ভেসে যায়,
যদি বর্ষে মুসলধারে, আধা সমুদ্রে বকা চরে,
হেসে সূর্য্য বসে পাটে, চাষার গরু বিকয় হাটে।

ইহার অর্থ এই; আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে সূর্য্য অস্ত গমন কালে যদি বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি বর্ষণ হয়, তবে সে বৎসর পর্ব্বতে অধিক বৃষ্টি হইবে, অন্যত্র অতি বৃষ্টির আশঙ্কা থাকিবে না, কিন্তু যদি স্থিরভাবে এমন বর্ষণ হয়, যে তাহাতে জমি ভিজিয়া যায়, তাহা হইলে সে বৎসর বৃষ্টির আতি-শয্যে জলপ্লাবন ঘটিবে। যদি মুসলধারে বৃষ্টি বর্ষণ

হয় অথবা বিন্দু মাত্রও বর্ষণ না হইয়া, সূর্য্য আলো বিতরণ করিতে করিতে অস্তগমন করে, তবে সে বৎসর অনাবৃষ্টি হইয়া সমুদ্রের জল পর্য্যন্ত কমিয়া যাইবে এবং কৃষকদিগের এরূপ দুরবস্থা ঘটিবে যে, তাহাদের হালের গরু পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে হইবে। এই প্রবাদের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোন সম্বন্ধ আছে কিনা, তাহা বিজ্ঞানবেত্তারা বলিতে পারেন, কিন্তু পরীক্ষা-দ্বারা ইহার সত্যতা বুঝা সাধারণের পক্ষে কঠিন।

শাকসবজি ও ফলের বাগান।

চারিদিক হইতে আলোক ও বায়ু প্রবেশের পথ থাকে, উদ্যানের জন্য এরূপ স্থান পছন্দ করিবে। কৃষিক্ষেত্র মাত্রেই বসতি স্থানের নিকট হইলে ভাল হয়। কৃষকেরা বলে "ক্ষেতি দেখি নিতি" অর্থাৎ ক্ষেত্র প্রত্যহ দেখা আবশ্যক। বিশেষতঃ সব্জি-বাগানের কার্য্য সর্ব্বদা না দেখিলে, অত্যন্ত ক্ষতি হয়। কৃষকেরা বলে,

"খাটে খাটায় দ্বিগুণ পায়,
বসে খাটায় অর্দ্ধেক পায়,
ঘরে থেকে পুছে বাৎ,
এবার যেমন তেমন আরবার হা ভাত।"

এই প্রবাদ বাক্যের মর্ম্ম এই, যে কৃষক নিজে ও কৃষাণদিগের সঙ্গে ক্ষেত্রের কাজ করিতে পারেন, তাঁহার প্রচুর লাভ হয়, ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া কৃষাণদিগকে খাটাইলে এবং ক্ষেত্রের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া কর্ত্তব্যের ব্যবস্থা করিলেও কৃষিকার্য্যে লাভ হইবে, কিন্তু যিনি সে কষ্ট স্বীকার করিতেও না চান, লাভ হওয়া দূরে থাক্, কৃষিকার্য্যে তাঁহার অন্নযোটা কঠিন হয়। ফলকথা শস্য ক্ষেত্র ও সব্‌জি বাগান সর্ব্বদা পরিদর্শন করা আবশ্যক।

বড় বড় গাছ বা ঝোপ, শাকসবজির পক্ষে বড় হানি জন্মায়, যেহেতু উহারা ভূমিকে ছায়া বিশিষ্ট করিয়া ফেলে এবং বড় বড় বৃক্ষের পত্র হইতে শাক-সবজির উপর যে জল পড়ে, তাহা বিষবৎ অপকারী, এই জন্য ঐ সকল গাছ যত পার কাটিয়া ফেলিবে। যে উদ্যান শাকসবজি ও ফল বৃক্ষ উভয়ের জন্য হয়, তথায় উত্তর ও পূর্ব্বদিকে শাকসবজি এবং দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে ফলবৃক্ষাদি রোপণ করিবে।

মধ্যবিত্ত গৃহস্থদিগের উদ্যানে ফুল অপেক্ষা ফল বৃক্ষের সংখ্যাই প্রায় বেশী। বোধহয় তাঁহারা অধিক ফল প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্যে ঘন ঘন অনেক ফল বৃক্ষ রোপণ করেন। তাহাতে আলোক ও বায়ু প্রবেশের পথ রুদ্ধ হইয়া বাগানের সৌন্দর্য্য ও

স্বাস্থ্য নষ্ট করে, অথচ তাঁহাদের বেশী ফল লাভের যে আশা, তাহাও পূর্ণ হয় না। কারণ ঘন ঘন বৃক্ষ জন্মিলে, পরস্পরের মূলে ও শাখায় সংঘর্ষণ হওয়াতে তাহারা সতেজ থাকিতে পারে না, সুতরাং বেশী ফল ফুল প্রসবেও সমর্থ হয় না। বাগানের সীমা বদ্ধ রাখার জন্য বেড়া দেওয়া কর্ত্তব্য। নতুবা বহু পরিশ্রমোৎপন্ন ফসল গবাদি পশুতে নষ্ট করিলে ক্ষতি ও মনস্তাপের সীমা থাকে না। অতএব অগ্রে বাগানের চারিদিকে বেড়া দিয়া পরে তাহাতে কৃষি-কার্য্য আরম্ভ করা উচিত। কৃষকেরা এই জন্য বলে, "চারিদিকে দিয়ে বেড়া তবে ধর চাষের গোড়া"। সাধারণতঃ মেঁদি গাছের বেড়া দিলে উদ্যান দেখিতে বড় সুন্দর হয়; কিন্তু গবাদি পশুর প্রবেশ নিবারণ নিমিত্ত কাঁটাগাছের বেড়া দেওয়াই ভাল।

এদেশে বেড়া দেওয়ার উপযুক্ত অনেক কাঁটা গাছ আছে। তাহাদের দ্বারা বেড়াদিলে উদ্দেশ্য সফল হয়, অথচ দেখিতেও তত মন্দ হয় না। স্থায়ী বেড়া দেওয়ার নানাবিধ উপায় সত্ত্বেও অনেকে মাদার, সজিনা প্রভৃতি গাছের বেড়া দিয়া উদ্যানকে কুৎসিত করিয়া ফেলেন। ঐসকল গাছ যখন বাড়িয়া উঠে, তখন বাগানে আলোক ও বায়ু প্রবেশের ব্যাঘাত হয়, বিশেষতঃ তাহারা বাগানের সীমা হইতে অনেক

দূর পর্য্যন্ত শিকড় ও ছায়া বিস্তার করিয়া অন্যান্য বৃক্ষ উৎপত্তির বাধা জন্মায়; এজন্য ঐ সকল গাছের বেড়া স্থায়ী হইলেও হানি জনক।

দো-আঁশ বা পলিমাটি, শাক সবজি ও ফলবৃক্ষের পক্ষে ভাল। বাগানের মৃত্তিকা ভাল না হইলে চাষের ব্যয় ও পরিশ্রম সকলই বৃথা হইবে। নিকৃষ্ট মৃত্তিকার একটি সামান্য লক্ষণ এই, তাহাতে দুর্ব্বা-ঘাস পর্য্যন্ত ভাল গজায় না। চা-খড়ি, কাদা, বালি ও উদ্ভিজ্জসার এই সকল পদার্থ সমানভাগে মিশাইলে যে মাটি প্রস্তুত হয়, তাহা অধিকাংশ বৃক্ষ ও শাকসব্জির পক্ষে বিশেষ উপযোগী। চা খড়ির অভাব হইলে, তাহার বদলে চূণ দিলেও চলিতে পারে।

উদ্যানের জলপ্রণালীর প্রতি বিশেষ মনোযোগ রাখা কর্ত্তব্য। বসতি স্থানের জল বাহির হইবার ভাল বন্দোবস্ত না থাকিলে যেমন মনুষ্যদিগের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, বৃক্ষদিগের পক্ষেও সেইরূপ হইয়া থাকে। এজন্য উদ্যানে জল বহির্গমনের উপযুক্ত পয়ঃ প্রণালী রাখা আবশ্যক। সেই প্রণালীগুলি প্রতি বৎসর বর্ষার পূর্ব্বে পরিষ্কার করিয়া দেওয়া উচিত।

কৃষিকার্য্যে জল সর্ব্বদা প্রয়োজন; সেই জল সঞ্চিত রাখিবার জন্য উদ্যানের আয়তনানুসারে এক

বা অধিক পুষ্করিণী খনন করা কর্ত্তব্য। পুষ্করিণীতে উদ্যানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।

বীজসংগ্রহের নিয়ম।

এদেশে লোকের মনে এইরূপ সংস্কার আছে যে, যে বীজ রোপণ করিলে অঙ্কুর জন্মে, সেই বীজই উত্তম, ফলফুলের উৎকর্ষাপকর্ষ মৃত্তিকার দোষগুণে হইয়া থাকে। মৃত্তিকার দোষ গুণে ফলফুল ভালমন্দ হয় তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য, কিন্তু কেবল মৃত্তিকাই যে ঐজন্য দায়ী, তাহা নহে; বীজের দোষগুণেও ঐরূপ ঘটিয়া থাকে। বীজ সংগ্রহ বিষয়ে এদেশীয় কৃষক-দিগের বড়ই তাচ্ছিল্য দৃষ্ট হয়। তাহারা সুপক্ক, অপক্ক, সতেজ, নিস্তেজ সকল ফল এক সঙ্গে সংগ্রহ ও সকলের বীজ এক সঙ্গে মিশ্রিত করে। বীজ বাছাই করিবার প্রথা এদেশে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই দোষে এদেশের অনেক শাকসবজি ও ফলের অবস্থা ক্রমশঃ নিকৃষ্ট হইয়া যাইতেছে।

আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, সতেজ বৃক্ষেই ভাল ফল জন্মে। উপযুক্ত সার দিয়া ও রীতিমত জমির পাইট করিয়া যত্নপূর্ব্বক প্রতিপালন করিলে, সকল বৃক্ষই সতেজ হইয়া উত্তম ফল ধারণ করে।

বীজ সংগ্রহের জন্য এই সকল ফলের মধ্যে যে গুলি বড় ও নিখুত তাহাই মনোনীত করিবে। একগাছে অনেক ফল থাকিলে, ফলের আকার অপেক্ষাকৃত ছোট হয়; এজন্য যে বৃক্ষের ফল হইতে বীজ সংগ্রহের কল্পনা থাকিবে, সে বৃক্ষে বেশী ফল না রাখিয়া কতক তুলিয়া লইবে; অবশিষ্ট ফল, গাছে থাকিয়া যখন সুপক্ক হইবে, তখন তাহা হইতে বীজ সংগ্রহ করিবে। সংগৃহীত বীজের মধ্যে অপুষ্ট বীজ গুলি বাছিয়া ফেলিয়া ভাল পুষ্ট বীজগুলি রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ যত্ন পূর্ব্বক রাখিবে। এই প্রকারের সংগৃহীত বীজ লইয়া যদি সুনিয়মে কৃষিকার্য্য করা যায়, তাহা হইলে ফলমূলের অবস্থা ক্রমশঃই উন্নত হইবে। ধান্যাদি শস্যের বীজ, তাহাদের উৎকৃষ্ট ফসল হইতে সংগ্রহ পূর্ব্বক ঝাড়িয়া পৃথক স্থানে যত্নপূর্ব্বক রাখিতে হয়। কেবল ধান্যের বীজ সংগ্রহ সময়ে দেশীয় কৃষকদিগের কথঞ্চিৎ যত্ন দেখিতে পাই।

কৃষি-যন্ত্র।

লাঙ্গল, জোয়াল, কোদাল, কাস্তে, বিদে, নীড়ানি, মৈ প্রভৃতি যন্ত্রগুলি কৃষিকার্য্যের জন্য কৃষকেরা সর্ব্বদা ব্যবহার করে। ঐ সকল যন্ত্র বোধহয়

সকলেই দেখিয়াছেন। উহারা অতি সামান্য উপাদানে প্রস্তুত হইলেও উহাদের দ্বারা গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন হয়। বর্ত্তমান সময়ে ক্ষেত্রের সকল কার্য্যই ঐ সকল যন্ত্রদ্বারা সম্পন্ন হইতেছে সত্য, কিন্তু যন্ত্রগুলি আদিমকালে যেরূপে প্রস্তুত হইয়াছিল, আজিও তদবস্থায় আছে। যদি কৃষকেরা শিক্ষিত হইত এবং এদেশে শিল্পচর্চ্চা থাকিত তাহাহইলে উহাদের উন্নতি বর্দ্ধন দ্বারা যে অপেক্ষাকৃত শ্রমলাঘব ও কার্য্যের সুবিধা হইতে পারিত তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহাহউক প্রচলিত যন্ত্রগুলির কার্য্যের কথা নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে।

লাঙ্গল—ইহা ভূমি কর্ষণের প্রধান যন্ত্র। লাঙ্গল ভিন্ন শস্যাদি ক্ষেত্রের কর্ষণ ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয় না। লাঙ্গলের ভালমন্দ, গরুর ভালমন্দের উপর অনেক নির্ভর করে। অর্থাৎ গরু ভাল হইলে লাঙ্গল দ্বারা কার্য্য বেশী, ও মন্দ হইলে কার্য্য কম হয়।

জোয়াল, ইহা লাঙ্গল চালাইবার সুবিধার জন্যই ব্যবহৃত হয়। এজন্য জোয়ালকে লাঙ্গলের অঙ্গ-বলিলেও চলে। উহাকে পৃথক যন্ত্র স্বীকার করাযায় এমন কোন কাজ উহাতে হয় না।

কোদাল—মাটি খোঁড়া, ক্ষেত্রের আইল বান্ধা ও ঝোড়া, পগার কাটা, জমি চাঁচা প্রভৃতি কার্য্যের

জন্য, কোদাল সর্ব্বদাই কৃষকদিগের প্রয়োজন। ফল ও সব্‌জি বাগানের মাটি কোদাল দিয়া খুঁড়িলে অধিক উপকার হয়। দশবার লাঙ্গলের চাষে যে ফল দর্শে, কোদাল দ্বারা একবার খোঁড়াতেই সেই ফল হইয়া থাকে। 'যো' পাইলে একজন কৃষাণে এক-দিনে দেড় বা দুই কাঠা জমি কোদ্‌লাইতে পারে।

বিদে—এই যন্ত্রকে কোন দেশে 'লাঙ্গলী' ও কোন দেশে 'আঁচড়া' বলে। বিদে ভিন্ন ধান্য ক্ষেত্রের আবাদ চলে না। ধান্য ক্ষেত্রে যে তৃণ জন্মে, মৈ ঘর্ষণে তাহার অঙ্কুর ভাঙ্গিয়া যায়, তৎপরে বিদে চালনা করিলে সমূলে উৎপাটিত হইয়া বিনষ্ট হয়। ইহাদ্বারা ক্ষেত্রের উপরের মাটি কর্ষিত হওয়ায় ধান্যাদি শস্য গাছের তেজ বৃদ্ধি হয়।

কাস্তে—শস্য পাকিলে গাছের সহিত সুপক্ক শস্য কাটিয়া আনিতে এবং ঘাস কাটিতে কাস্তের আবশ্যক হইয়া থাকে।

নীড়ানি—শস্যক্ষেত্রের মধ্যে তৃণাদি যে সকল আগাছা জন্মে, তাহা সমূলে তুলিয়া ফেলিবার জন্য এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। কুড়ানী ও খুরপী নামে আর দুই প্রকার যন্ত্র আছে, তাহাদের দ্বারা ক্ষেত্রবিশেষের তৃণাদি উৎপাটিত হয়।

মৈ—কর্ষিত ক্ষেত্রে মৈ টানিলে মৃত্তিকা গুড়া হয়, উচু নীচু সমান হইয়া ক্ষেত্র সমতল হয় এবং মৈ ঘর্ষণে মাটি চাপিয়া যাওয়ায় ক্ষেত্রের 'যো' রক্ষা হয়। ধান্য ক্ষেত্রে যে তৃণ জন্মে, মৈ ঘর্ষণ ভিন্ন তাহা বিনাশ করা কঠিন।

সুকৃষকের লক্ষণ।

১। সুকৃষক অনলস; তিনি কৃষিকার্য্য স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করেন, অন্যের উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন না, তিনি জানেন নিজে তত্ত্বাবধান না করিলে কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না।

২। সুকৃষক, ক্ষেত্রের কোন্ কাজ কোন্ দিন করিতে হইবে, ক্ষেত্রের অবস্থা দেখিয়া পূর্ব্বেই তাহার বন্দোবস্ত করেন। তিনি জানেন পূর্ব্বে ব্যবস্থা না করিলে ব্যস্ততা প্রযুক্ত কাজ ভাল হয় না।

৩। সুকৃষকের যন্ত্রগুলি উত্তম; তিনি জানেন ভগ্ন ও অকর্ম্মণ্য যন্ত্রে কাজ করিলে কৃষাণ খরচ বেশী হয়, অথচ কাজ ভাল হয় না।

৪। সুকৃষকের গরু ভাল; তিনি জানেন ভাল গরু না হইলে, চাষ দিতে সময় বেশী লাগে, তাহাতে ক্ষতি ও বিরক্তি জন্মে।

৫। সুকৃষক গো পালনে পটু; তিনি জানেন কৃষিকার্য্যে গরু প্রধান সহায়, তাহাকে ভাল আহার না দিলে সে দুর্ব্বল হইবে, উত্তম স্থানে না রাখিলে রুগ্ন হইবে, ক্ষমতাতিরিক্ত খাটাইলে সে নির্জীব হইয়া পড়িবে।

৬। সুকৃষক কুসংস্কার শূন্য; তিনি কেবল প্রবাদ বচনের প্রতি নির্ভর করিয়া কাজ করেন না, তিনি জানেন সকল দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা ও ক্ষেত্রের অবস্থা একরূপ নহে, সুতরাং এক প্রবাদ সকল দেশের পক্ষে খাটিতে পারে না; তিনি প্রবাদ বচন অমান্য করেন না, কিন্তু অবস্থা বিবেচনায় যেখানে তাহা না খাটে, সেখানে তাহা লঙ্ঘন করিতে কুণ্ঠিত হন না।

৭। সুকৃষকের ক্ষেত্র বৃথা পড়িয়া থাকে না; তিনি শস্যাদির প্রকৃতি এবং ক্ষেত্রের অবস্থা বুঝিয়া ক্ষেত্র খাটাইবার সুযোগ পাইলে তাহা পরিত্যাগ করেন না।

৮। সুকৃষকের ফসল ভাল হয়; তিনি ভাল বীজ ব্যবহার করেন, চাষের সুযোগ ছাড়েন না,

ক্ষেত্রের পাইট ভালরূপে করেন, জমিতে আবশ্যক মত সার দেন, যে সময়ের যে কাজ তাহা করিতে অবহেলা করেন না।

৯। সুকৃষক সর্ব্বদা প্রফুল্ল চিত্ত; তাঁহাকে চাকরি করিয়া লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় না, তাঁহার সংসারে অনাটন থাকে না, পরিশ্রমে তাঁহার শরীর হৃষ্ট, পুষ্ট ও বলিষ্ঠ, শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শনে তাঁহার মনে আনন্দ উদয় হয়।

১০। সুকৃষকের বাড়ীখানি যেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার; গোশালা গরুপূর্ণ, গোলা শস্যে ভরা, চারিদিকে শাক সব্‌জি ফলমূলের স্তূপ, যেন দেশের লোকের খাদ্য দ্রব্য তাঁহার বাড়ীতেই মজুত রহিয়াছে।

১১। সুকৃষকের আদর ও সম্মান বেশী; তিনি চাষের কার্য্যকে সম্মানের কার্য্য বিবেচনা করেন, তিনি জানেন এ দেশের চাষারা মূর্খ, তাই তাহারা লোকের নিকট ঘৃণিত, নতুবা চাষা এই নামের জন্য তাহারা ঘৃণিত নহে, তিনি শিক্ষিত, তাঁহার কার্য্য নিপুণতাপূর্ণ ও কৌশলময়, তিনি কৃষি কার্য্যে প্রচুর লাভ করেন, দেশের মধ্যে তিনি গণ্য মান্য ব্যক্তি।

১২। সুকৃষকের দয়া ধর্ম্ম আছে; কৃষির বলে ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দিতে তিনি কুণ্ঠিত হন না, তাঁহার ব্যবসায়ে প্রতারণা প্রবঞ্চনার সংস্রব নাই, তাঁহার

অন্তঃকরণঅভিমান শূন্য, সরল ও পবিত্র; তিনি পরের অনিষ্টকরেন না, কোন প্রকার কুক্রিয়ায় লিপ্ত থাকেন না, প্রকৃতির অনুগ্রহে তিনি বিশুদ্ধ সুখ ভোগ করেন।

ধান্য।

ধান্য ভারতবর্ষের প্রধান শস্য। ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গদেশে এই শস্যের ব্যবহার অত্যন্ত অধিক। ইহা বঙ্গবাসিদিগের প্রধান খাদ্য, এজন্য বাঙ্গালা দেশে এই শস্যের যত্ন আবাদ হয়, বোধ হয় আর কোথাও তত হয় না। ধান্য যে কত রকম আছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। কিন্তু সমস্ত ধান্যই আশু, আমোন, বোরো ও জলি এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত।

আশুধান্য।

যত প্রকার ধান আছে, তাহাদের মধ্যে এই শ্রেণীর ধান শীঘ্র পাকে, এজন্য ইহার নাম আশু ধান্য হইয়াছে। সচরাচর লোকে ইহাকে আউস ধান বলে। বেণাফুলী, চন্দ্রমণি, সূর্য্যমণি, লক্ষ্মীজটা, জগদ্দুর্লভ, ঘৃতকাঞ্চন, ছোটকুমারী, কেলে, খেজুর কান্দি প্রভৃতি অনেক প্রকার আউস ধান আছে।

সমতলাদি যে তিন প্রকার উচ্চ ক্ষেত্রের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, সেই সকল উচ্চ ভূমিতে এবং চরা জমিতে এই ধান জন্মিয়া থাকে। ঐ সকল ক্ষেত্রে অগ্রে রবি ফসল জন্মাইয়া পরে আউস ধানের আবাদ হইতে পারে। ফাল্গুন মাসেই রবি ফসল উঠিয়া গিয়া জমি খালি হয়। বৃষ্টির সুবিধা হইলে, সেই সময় হইতে ক্ষেত্রে চাষ আরম্ভ করিতে হয়। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ বীজ বপনের সময়। ঐ সময় পর্য্যন্ত যত বার বৃষ্টি হইবে, তত বারই চাষ দেওয়া কর্ত্তব্য। চাষে চাষে যখন মাটি খুব গুড়া হইবে এবং জমিতে তৃণাদি কিছু না থাকিবে, তখন বীজ বপনের উপযুক্ত পাইট হইবে। বপনের জন্য প্রতি বিঘায় দশ সের বীজ লাগে।

বীজ বপনের চারি পাঁচ দিন পরে অঙ্কুর জন্মে। ধান্যের অঙ্কুরের সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার তৃণাঙ্কুর ক্ষেত্রময় উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ সকল তৃণ বর্দ্ধিত ও বদ্ধমূল হইলে ধান্যের অত্যন্ত ক্ষতি করে, এ জন্য ধানের চারাগুলি একটু বড় হইয়া উঠিলে, মৈ ও বিদে টানিয়া তৃণগুলি বিনাশ করিতে হয়। আট দশ দিন অন্তর 'যো' মত দুই তিন বার বিদে ও মৈ টানা আবশ্যক হইয়া থাকে। বিদে টানিলে গোড়ার মাটি আল্‌গা হওয়ায়, চারা সমধিক তেজ করিয়া

উঠে। মৈ ও বিদে দিলেও যে সকল তৃণ না মরে, নীড়ান দ্বারা তাহা বাছিয়া ফেলিতে হয়। জমির পাইট ভাল রূপ না হইলে আউস ধান ভাল জন্মে না।

শ্রাবণ মাসে গাছগুলিতে থোড় জন্মে; তখন বৃষ্টির প্রয়োজন; বৃষ্টি না হইলে এই সময়ে জল সেচন করিতে হয়। কিন্তু সিঞ্চিত জলে, বৃষ্টির জলের ন্যায় উপকার হয় না। বীজ বপনের তিন মাস পরে এই ধান পাকিয়া উঠে। ইহার ক্ষেত্রে পুকুরের পাঁক, খৈল অথবা গোবর সার দিলে অত্যন্ত উপকার হয়।

আমোন ধান্য।

আশু ধান্য অপেক্ষা আমোন ধান্য উৎকৃষ্ট এবং ইহার আবাদে পরিশ্রম কম, এজন্য কৃষকেরা আমোন ধানই বেশী উৎপন্ন করিয়া থাকে। বীজ বপন ও চারা রোপণ উভয় প্রকারেই এই ধান জন্মে। চারা রোপণকে রোয়া বলে। বপন করিতে হইলে বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসে বীজ ছড়াইতে হয়। রোয়ার জন্য আষাঢ় শ্রাবণ উপযুক্ত সময়। উপ্ত ও রোপিত উভয় নিয়মের ধান্যই অগ্রহায়ণ বা পৌষ মাসে পাকিয়া উঠে। হেমন্ত কালে পাকে বলিয়া এই ধান্যকে হৈমন্তিক ধান্যও বলে।

আমিরভোগ, বাদশাভোগ, কৃষ্ণভোগ, রাজভোগ, খাসভোগ, রামশালী, কুসুমশালী, পরমান্ন শালী, বাক্‌তুলশী, বাক্‌চুর, দুধকলম, দাদখানি, হরিণখুরী, লোণা, বাসমতী প্রভৃতি আমোন ধান্যের অনেক প্রসিদ্ধ জাতি আছে। জোল, বিল প্রভৃতি নিম্ন জমিতে এই ধান ভালরূপ জন্মে। ইহার আবাদের অন্যান্য প্রণালী আশুধান্যের ন্যায়; কেবল প্রভেদ এই, ইহার ক্ষেত্রে মৈ, বিদে, নিড়ানী, খুব কম আবশ্যক হয়।

এই ধান্য উৎপন্নের জন্য অধিক বৃষ্টির প্রয়োজন, গাছ বড় হইয়া উঠিলে গোড়ায় নিয়ত অর্দ্ধ হস্ত বা তদপেক্ষা অধিক জল থাকা চাই, ভাদ্র মাসে ঐ জল একবার শুকাইয়া ক্ষেত্র কর্দ্দমসার হওয়ার পর পুনরায় নূতন জলে ক্ষেত্র পূর্ণ হইলে, বিশেষ উপকার দর্শে। এই ধান্যের জন্য যে সময়ে যে রূপ বৃষ্টির প্রয়োজন নিম্নলিখিত কৃষি প্রবাদে তাহা প্রকাশিত আছে।

"অষাঢ়ে ধূলি, শ্রাবণে পালি, সিংহে শুকো,
কন্যায় কাণে ক্যাণ;
বিনাবায়ু বর্ষে তুলা, কোথায় রাখি ধান।"

অর্থাৎ আষাঢ় মাসের বৃষ্টিতে ক্ষেত্রে জল দাঁড়াইবে না, শ্রাবণ মাসের বৃষ্টিতে জল দাঁড়াইবে

এবং সেই জল শুকাইতে না শুকাইতে পুনরায় বৃষ্টি হইবে, ভাদ্র মাসে অধিক বৃষ্টি হইবে না, আশ্বিন মাসে প্রচুর বৃষ্টি হইয়া ক্ষেত্র জলময় হইবে, কার্ত্তিক মাসে বিনা বাতাসে দুই এক পশ্‌লা বৃষ্টি হইবে; এরূপ হইলে ধান্য প্রচুর জন্মিবে। কিন্তু প্রকৃতি সকল বৎসর কৃষকদিগের এত আবদার রক্ষা করেন না; সুতরাং সকল বৎসর এই ধান্যের আবাদ নিরাপদে সম্পন্ন হয় না।

কার্ত্তিকমাসে গাছে শীষ ধরে, তখন অধিক বৃষ্টি হইলে ধানে চিটে পড়ে। অগ্রহায়ণ মাসে ধান পাকিতে আরম্ভ করে। অগ্রহায়ণের শেষ বা পৌষের প্রথম হইতে কৃষকেরা ধান কাটিতে প্রবৃত্ত হয়। বিলান জমির ধান কিছু বিলম্বে কাটা হইয়া থাকে। পাকা ধানে বৃষ্টি পড়িলে ঝরিয়া যায়; এজন্য অগ্রহায়ণ ও পৌষ এই দুই মাসে বৃষ্টি হওয়া বড়ই অনিষ্টজনক। মাঘমাসে ধান কাটা বাকি থাকে না, নূতন আবাদের জন্য চাষ দেওয়া চলে এবং যব গমাদি রবিশস্যের পক্ষেও উপকার হয়, এইজন্য কৃষকেরা বলে,

> "যদি বর্ষে অগ্রাণে, রাজা বেরহন মাগনে,
> যদি বর্ষে পৌষে, কড়ি হয় তুষে,
> যদি বর্ষে মাঘের শেষ ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।"

দেশের প্রাকৃতিক অবস্থাভেদে ও ক্ষেত্র বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ধান্যের আবাদ প্রণালীরও কিছু কিছু প্রভেদ লক্ষিত হয়। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সে সকল উল্লেখের আবশ্যক নাই।

বোরোধান।

বোরোধান অন্য সকল ধান অপেক্ষা নিকৃষ্ট। কিন্তু ইহার ফলন সকল ধান অপেক্ষা বেশী। ইহা ইতর লোকেই অধিক ব্যবহার করে। অল্প গভীর জোল ও বিল জমিতে এই ধান্যের আবাদ হইয়া থাকে।

অল্পজলময় ক্ষেত্র পায়ের দ্বারা কাদা করিয়া তাহাতে এই ধান্যের চারা রোপণ করিত হয়। জল কাদাই এই ধান্যের জীবন। ইহা স্থান বিশেষে প্রায় বারমাস জন্মে, কিন্তু সাধারণতঃ পৌষ, মাঘ বা ফাল্গুন মাসে রোয়ার সময়। রোপণের অগ্রপশ্চাতানুসারে চৈত্র, বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসে ধান পাকে। শিলা বৃষ্টিতে এই ধানের বড় অপকার করে। ইহা সচরাচর প্রতি বিঘায় ১৬।১৭ মণ জন্মে।

জলিধান।

জলিধান নদী, খাল, বিল প্রভৃতি জলাশয়ের তীরস্থ ক্রম নিম্ন ভূমিতে জন্মে। একদিকে জল ও অন্যদিকে উচ্চভূমি বলিয়া ক্ষেত্র সর্ব্বদা সরস থাকে। ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে বীজ বপন করিতে হয়; ইহার পূর্ব্বেই কর্ষণাদি দ্বারা ক্ষেত্রের পাইট সম্পন্ন করা আবশ্যক।

ইহার আবাদের নিয়ম প্রায় আশুধান্যের ন্যায়। প্রভেদের মধ্যে ক্ষেত্রে বিদে চালনার আবশ্যক হয় না। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে এই ধান পাকে। জলের ধারে জন্মে বলিয়াই বোধহয় ইহার নাম জলিধান হইয়াছে। জলিধানকে ধান্যের একটি পৃথক শ্রেণী না ধরিয়া আশুধান্যের মধ্যে গণনা করাই কর্ত্তব্য।

গোধূম।

ভূমণ্ডলের অধিকাংশ দেশের লোকে গম আহার করে। ইহা তণ্ডুল অপেক্ষা পুষ্টিকর খাদ্য। উচ্চ নিম্ন সকল প্রকার ক্ষেত্রেই গম জন্মিতে পারে। উচ্চ ভূমি হইলে কার্ত্তিক মাসে এবং নিম্ন ভূমি হইলে অগ্রহায়ণ মাসে বীজ বপন করা কর্ত্তব্য। এক বিঘা

জমিতে পাঁচ সের বীজ লাগে। পলি বা দো-আঁশ মৃত্তিকাবিশিষ্ট ক্ষেত্র গমের পক্ষে বিশেষ উপ-যোগী।

নিম্নক্ষেত্রে গমের আবাদ করিলে, তাহাতে প্রায় জলসেচনের আবশ্যক হয় না। কিন্তু উচ্চভূমির আবাদে দুইবার জল সেচন করিতে হয়। ক্ষেত্রে তৃণাদি আগাছা জন্মিলে মধ্যে মধ্যে নিড়ান কর্ত্তব্য।

গমের চারা একটু বড় হইয়া উঠিলে, কোন কোন দেশের কৃষকেরা ক্ষেত্রে কিছু ক্ষণ ভেড়া ছাড়িয়া দিয়া গাছগুলি খাওয়াইয়া দেয়; তাহাতে নূতন ফেক্‌ড়ি জন্মিয়া গাছ ঝাড়াল হইয়া উঠে। ফাল্গুন মাসে গম পাকে; এই সময়ে শিলাবৃষ্টি হইলে গমের পক্ষে বড়ই অপকার হয়। গম যত শ্বেত ও পুষ্ট-দানা হইবে তত ভাল। দুধে ও গঙ্গাজলি এই দুই জাতীয় গম ঐ গুণের জন্য প্রসিদ্ধ।

যব।

যবের ছাতু পুষ্টিকর খাদ্য। ছাতুর ব্যবহার বাঙ্গালাদেশ অপেক্ষা পশ্চিম অঞ্চলে বেশী, এজন্য যবের আবাদও সেইদিকে অধিক। চিকিৎসকেরা

রোগী বিশেষে যবের মণ্ড পথ্য দিয়া থাকেন। যবের ভাত ভাল হয় না।

যবের গাছ দেখিতে ঠিক গমের গাছের ন্যায় এবং ইহার আবাদ প্রণালীও গমের অনুরূপ। ক্ষেত্রে তিন চারিবার লাঙ্গল ও মৈ দিয়া কার্ত্তিক বা অগ্রাহায়ণ মাসে বীজ ছড়াইবে। বীজ বপনের পর আল্‌গাভাবে একবার লাঙ্গল চালাইয়া মৈ দিতে হয়। চারা বড় হইয়া উঠিলে, ক্ষেত্র নিড়াইয়া দেওয়া ভিন্ন অন্য কোন পরিশ্রম নাই। ফাল্গুন মাসে যব পাকিয়া উঠে।

যব অল্প পরিমাণে জন্মান আবশ্যক হইলে, ছোলা বা মুসুরীর সহিত এক সঙ্গে ক্ষেত্রে ছড়ান হইয়া থাকে, তাহাতে ছোলা মুসুরীর কোন ক্ষতি হয় না, অথচ যব পাওয়া যায়। ভালরূপ আবাদ হইলে প্রতি বিঘায় সাত আট মণ যব জন্মে।

ছোলা।

ডাইল, ছাতু ও ঘোড়ার দানার জন্য ছোলার ব্যবহার খুব বেশী। ছোলা দুই প্রকার, লাল ও সাদা। সাদা ছোলাকে কাবরিছোলা বা বুট কহে। উভয়েরই আবাদ প্রণালী একরূপ। প্রায় সকল

প্রকার মৃত্তিকাতেই ছোলা জন্মিয়া থাকে। কিন্তু মৃত্তিকায় এটেলের অংশ অধিক থাকিলে, তথায় ইহা ভালরূপ জন্মে।

আশ্বিনের শেষ হইতে অগ্রহায়ণের প্রথম পর্য্যন্ত বীজ বপনের উপযুক্ত সময়। প্রতি বিঘায় সাড়ে সাত সের বীজ লাগে। বীজ বপনের পর যবের ন্যায় একবার লাঙ্গল ও মৈ দিতে হয়। মাঘ বা ফাল্গুন মাসে গাছে ফল ধরে এবং ফাল্গুনের শেষ হইতে পাকিতে আরম্ভ করে। দক্ষিণে বাতাস আরম্ভ হইলে ছোলার মধ্যে একরূপ পোকা জন্মিয়া বড় অনিষ্ট করে, এজন্য অগ্রিম বীজ বুনিতে পারিলে, দক্ষিণে বাতাস আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বেই ফসল সংগ্রহ হয়।

সরিষা।

তৈলের জন্যই সরিষার ব্যবহার অধিক, তদ্ভিন্ন মসলারূপেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দো-আঁশ মাটি, পলি মাটি, ও চরা জমিতে সরিষা উত্তম জন্মে। বর্ষা শেষ হইলে আশ্বিন মাসে ক্ষেত্রের কর্ষণাদি পাইট কার্য্য শেষ করিয়া বীজ ছড়াইতে হয়। প্রতি বিঘায় এক সের বীজ লাগে। গাছ বড় হইলে ক্ষেত্রে যে

সকল আগাছা জন্মে তাহা নিড়াইয়া ফেলিতে হয়। ক্ষেত্রে জল সেচন করিতে হয় না, শিশিরের জল ইহার পক্ষে মহোপকারী। ফাল্গুন মাসে সরিষা পাকে; তখন পক্ক শস্য সমেত গাছগুলি কাটিয়া লইতে হয়; কাটিতে বিলম্ব করিলে শুঁটি ফাটিয়া অনেক সরিষা মাটিতে পতিত হয়।

শ্বেত ও ধূসর এই দুই বর্ণের সরিষা দেখা যায়। উভয় প্রকার সরিষার আবাদের নিয়ম এক। ধূসর বর্ণের সরিষার মধ্যে রাই সরিষা বড়। সচরাচর প্রতি বিঘায় চারি পাঁচ মণ সরিষা জন্মে।

পাট।

চট, থলে, দড়ি, কাছি, প্রভৃতির জন্য আমাদের সর্ব্বদাই পাটের আবশ্যক, ইহা ভিন্ন ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে পাটের দ্বারা কাপড় প্রস্তুত হইয়া থাকে। বিদেশে প্রচুর রপ্তানী হেতু,আজ কাল পাটের ব্যবসায় বড় লাভজনক হইয়াছে। পাটে অধিক লাভ হওয়াতে অনেক স্থানের কৃষকেরা ধান্যের ক্ষেত্রে পাটের আবাদ আরম্ভ করিয়াছে।

ফরিদপুর, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, ঢাকা, চব্বিশ-পরগণা, হুগলি, বর্দ্ধমান, পাটনা, ময়মনসিং, বগুড়া,

গোয়ালপাড়া, কোঁচবেহার প্রভৃতি জেলায় অনেক পাট জন্মিয়া থাকে। যে পাটের আঁস লম্বা, বর্ণ শ্বেত ও উজ্জ্বল এবং যাহা হাতে লইয়া চাপিলে কোমল বোধ হয়, সেই পাট উত্তম। করিমগঞ্জে, চাকরা-বাদি ও দেশোয়াল এই তিন প্রকার পাট ঐ সকল গুণের জন্য অধিক বিখ্যাত। পাটকে কোন কোন দেশে কোষ্টা বলে।

পাট সাধারণতঃ সকল মাটিতেই জন্মে, কিন্তু দোঁ-আঁশ মাটি এবং পলিমাটি ইহার পক্ষে অধিক উপ-যোগী। ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে গোবর সার দিলে পাট ভাল জন্মে। চৈত্র বৈশাখ মাসে পাটের বীজ বপন করিতে হয়; বীজ বপনের পূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ লাঙ্গল ও মৈ দিয়া ইহার ক্ষেত্রকে ভালরূপে পাইট করিয়া লইতে হয়। এক বিঘা জমি বুনিতে আড়াই সের বীজ লাগে।

গাছ বড় হইয়া উঠিলে, ক্ষেত্র নিড়ান ভিন্ন ইহার আবাদে আর কোন পরিশ্রম নাই। গাছ যত সরল হইয়া উঠে পাটও তত ভাল হয়। গবাদি পশুতে গাছের ডগা খাইয়া ফেলিলে, গাছ সরল না হইয়া অধিক ডাল পালা বিশিষ্ট হয়, তাহাতে আঁস ভাল বাহির হয় না এবং ঘন ঘন গাঁইটের জন্য আঁশ খারাপ হয়।

আষাঢ় শ্রাবণ মাসে গাছে ফুল ধরে, তখন গাছ কাটিয়া জলে পচাইতে হয়। গাছগুলি জলে ভাসিয়া না থাকে, এজন্য উপরে ভার চাপান আবশ্যক। অন্ততঃ দশ দিন জলে না থাকিলে পাট পচে না; অবস্থা বিশেষে পোনের যোল দিনও পচিতে লাগে। অধিক পচিলে পাট নষ্ট হইয়া যায়, এজন্য মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। পাট পচিলেই বিলম্ব না করিয়া আঁস বাহির করতঃ উত্তমরূপে জলে ধৌত করিতে হয়, ইহাকে পাট কাচা বলে। কাচা হইলে আড় বা দড়ির উপর ঝুলাইয়া শুকাইলেই পাট প্রস্তুত হয়। শুকাইবার সময় বা ধৌত করিবার সময় পাটের আঁশ এলো মেলো না হইয়া গোছাল মত থাকে এরূপ সাবধান হওয়া আবশ্যক। এক বিঘা জমিতে সাত আট মণ পাট জন্মে।

তামাক।

মনুষ্য সমাজে তামাকের ব্যবহার অত্যন্ত অধিক। পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানের লোকে কোন না কোন প্রকারে তামাক ব্যবহার করে, এজন্য তামাক একটি প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। কৃষকেরা ইহার আবাদে বিলক্ষণ লাভ করে। এদেশে যে সকল তামাক জন্মে তাহা তত উৎকৃষ্ট জাতীয় নহে। আমেরিকার

ভর্জিনিয়া, কিউবা, অরিনিকো প্রভৃতি স্থানের তামাক ভুবন বিখ্যাত। যদি এদেশের কৃষকেরা আমেরিকার বীজ লইয়া উৎকৃষ্ট তামাকের আবাদ করে, তাহা হইলে আরও অধিক লাভ করিতে পারে। বাঙ্গালা দেশে রঙ্গপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি জেলায় অনেক তামাক জন্মে। ঐ অঞ্চলের তামাক অপেক্ষাকৃত উত্তম।

তামাকের বীজ একেবারে ক্ষেত্রে ছড়ান হয় না। অগ্রে চারা প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। চারা প্রস্তুত জন্য কোন্ উচ্চ স্থানের মৃত্তিকা উত্তমরূপে পাইট করিয়া আশ্বিন মাসে তথায় বীজ বপন করিতে হয়। বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখিলে ঐ স্থানের উপর আচ্ছাদন দেওয়া কর্ত্তব্য। কারণ বৃষ্টির জল পড়িলে বীজ বা চারা উভয়ই নষ্ট হয়। রৌদ্র ও শিশির প্রাপ্তির ব্যাঘাত না ঘটে, এজন্য অন্য সময়ে আচ্ছাদন সরাইয়া রাখিতে হইবে। চারাগুলি পাঁচ ছয় অঙ্গুল পরিমাণে বড় হইলে, তখন তাহাদিগকে তুলিয়া স্থায়ীরূপে ক্ষেত্রে রোপণ করিবে।

দো-আঁশ মৃত্তিকা তামাকের পক্ষে উপযোগী। ইহার ক্ষেত্রের পাইট ভালরূপ হওয়া আবশ্যক। ক্ষেত্রে ছাই, গোবর বা উদ্ভিজ্জ সার দিলে বিশেষ উপকার হয়। চারা রোপণ সময়ে ঐ পাইট করা

ক্ষেত্রের মধ্যে লাঙ্গল দ্বারা দুই হাত অন্তর সরলভাবে এক একটি রেখা ফেলিবে। সেই রেখার মধ্যে সারিবন্দিরূপে দুই দুই হাত অন্তর চারা বসাইবে। অনন্তর প্রখর রৌদ্রের সময় তিন চারিদিন তাহা-দিগকে কলার খোলা দ্বারা ঢাকিয়া রাখিবে এবং যাবৎ মাটিতে শিকড় না লাগে তাবৎ প্রত্যহ বৈকালে গোড়ায় অল্প অল্প জল দিবে।

তামাকের ক্ষেত্র পরিষ্কার রাখার জন্য, আবশ্যক মত নিড়াইবে; কিন্তু সাবধান, যেন গাছের শিকড়ে আঘাত না লাগে। গাছ বড় হইয়া উঠিলে ১২।১৪ দিন অন্তর প্রতি দুই সারির মধ্যস্থ মৃত্তিকা লাঙ্গল দিয়া আল্‌গা করিয়া দিতে হয়, কিন্তু সে লাঙ্গল মানুষে টানে, গরুদ্বারা টানাইলে চারা নষ্ট করিয়া ফেলে।

তামাকের গাছ একহাত পরিমাণে বাড়িয়া উঠিলে, গাছের মাথা ও গোড়ার পাতা ভাঙ্গিয়া দিবে। গাছে আট নয়টির অধিক পাতা রাখিলে তামাক ভাল হয় না। পৌষ মাসে সপ্তাহে এক দিন জল দিবে। মাঘ মাসে অধিক জলের প্রয়োজন হয় না, মৃত্তিকা নিতান্ত নীরস বোধ হইলেই তখন জল সেচন করিবে।

মাঘ মাসের শেষ হইতে পাতা পাকিতে আরম্ভ করে, তখন শিলাবৃষ্টি হইলে তামাক নষ্ট হইয়া যায়।

পাকিবার সময় পাতার বর্ণ কাল বা তামার ন্যায় হয়, তখন গাছের কিয়দংশ ছালের সহিত পাতা গুলি কাটিয়া লইবে এবং দড়ি বা বাঁশের উপর রাখিয়া শুকাইবে। শুকাইবার সময় বৃষ্টি হইয়া যদি তামাক ভিজিয়া যায় তবে তামাকে তেজ থাকে না। আবাদের কার্য্য ভালরূপ হইলে প্রতিবিঘায় পোনের ষোল মণ তামাক জন্মে এবং শতাধিক টাকা লাভ হয়।

কলা।

কলাগাছ আমাদের দেশের এক প্রকার কল্পতরু। ইহার ফল, ফুল, গাছ, পাতা সকলই আমাদের প্রয়োজনীয়। কলার মোচা ও থোড় উৎকৃষ্ট তরকারি এবং পাতা উত্তম ভোজন পাত্র। ডাক্তারেরা বলেন, ঘা অথবা নালির স্থানে গটাপারচা যে কাজে লাগে, কলাপাতাও সেই কাজে লাগে ও তাহাতে সেইরূপ উপকার দর্শে। চোখওঠা বা চখের অন্য কোন ব্যারাম হইলে চস্‌মা কি সবুজ কাপড়ের পরিবর্ত্তে কচি কলার পাতা দিয়া ঢাকিয়া দিলে বিশেষ উপকার হয়। কলাগাছে ছুরি মারিলে যে পরিষ্কার সাদা জল বাহির হয়, তাহা রীতিমত পান করিলে দুঃসাধ্য রক্ত বমন ও কাশরোগ আরোগ্য হয়।

কদলী ফলেরও অশেষ গুণ; ইহার ন্যায় উপাদেয়, মধুর, বলকারক এবং স্বাস্থ্যপ্রদ ফল অতি অল্পই আছে, অথচ এত অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে আর কোনফল উৎপন্ন হয় না। কদলীর পুষ্টিকারিতা গুণ সম্বন্ধে স্কটলণ্ডের ডাক্তার জন্‌সন বলিয়াছেন, আলু ও কলা উভয়েই একরূপ পুষ্টিকর। প্রসিদ্ধ রসায়নজ্ঞ পণ্ডিত বুসিগোর মতে কলা আলু অপেক্ষাও পুষ্টিকর। আমেরিকার কোন কোন স্থানে কলা প্রধান খাদ্য; সেখানে কাঁচকলা কাটিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া গুড়া করিয়া সেই গুড়ার রীতিমত বাণিজ্য হইয়া থাকে। বিলাতের সাহেবেরা ঐ গুড়া সুখাদ্য বলিয়া ভোজন করেন। কলার এত গুণের জন্যই বোধহয় পূর্ব্বকালে আমাদের দেশের ব্রাহ্মণেরা চালকলা ভোজী ছিলেন এবং এখন এদেশবাসী সাহেবেরা পাকা কলার এত ভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

নূতন বাগানে অন্য চারাগাছ বসাইবার পূর্ব্বে কলাগাছ রোপণ করিলে ভূমি সরস থাকে। কলার বাসনা পোড়াইয়া যে ক্ষার হয়, তাহা পল্লীগ্রামের রজকেরা সাবানের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিয়া সুন্দর কাপড় কাচিয়া থাকে। কিন্তু কলাগাছের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান উপযোগিতা এই, ইহা হইতে অতি সুন্দর ও দৃঢ় আঁশ পাওয়া যায়, ঐ আঁশ রেসমের ন্যায় উজ্জ্বল

ও মসৃণ। কলিকাতার গত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে ভারত প্রদর্শনী ক্ষেত্রে যে স্থানে ঢাকার কাপড় প্রদর্শিত হইয়াছিল, সেই স্থানে ৪০৲ টাকা মূল্যের একখানি কলার আঁশে প্রস্তুত কাপড় ছিল। দক্ষিণ সমুদ্রে মৎস্য ধরিবার জন্য যে সকল জাহাজ নিযুক্ত আছে, তাহাতে কলার আঁশের দড়ি ও কাছি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কলার বাসনায় যে উত্তম কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে, তাহারও পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার রয়লি বলেন সকল প্রকার কাগজ প্রস্তুতের জন্য কলার আঁশ সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। তিনি আরও বলেন ব্যবসায় চলিবার মত ইহার আঁশ বাহির করিবার উপায় করিতে পারিলে, প্রচুর লাভ হইতে পারে। আমাদের দেশে কলাগাছের অভাব নাই এবং অতি সামান্য পরিশ্রমে ইহার আবাদ হয়, কিন্তু এদেশের লোকে এই সকল লাভজনক বিষয়ের কিছুই অনুসন্ধান করেন না ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়।

ভারতবর্ষে অনেক জাতীয় কলা দৃষ্ট হয়। আমরা অনুসন্ধান করিয়া এ পর্য্যন্ত আটাশ প্রকার কলার পরিচয় অবগত হইয়াছি; তন্মধ্যে চাঁপা, কাঁটালি, সবরি, অগ্নীশ্বর, রাম, অনুপান, কানাইবাঁশী, মোহনবাঁশী, সিঙ্গাপুরী, পিনাং, কাবুলি, মর্ত্তমান প্রভৃতি

জাতিগুলি অধিক উৎকৃষ্ট ও প্রসিদ্ধ। সিঙ্গাপুরী, পিনাং, কাবুলি, মর্ত্তমান এই সকল কলার নামের দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে, উহারা ভিন্ন দেশ ও দ্বীপ হইতে এদেশে আনীত হইয়াছে। আদিম অবস্থায় সকল কলাই বীজ পূর্ণ ছিল, চাষের পারিপাট্যে ক্রমশঃ বীজ হ্রাস হইয়া শাঁসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং কতক জাতি একেবারে বীজ শূন্য হইয়াছে। তরকারির জন্য কাঁচা অবস্থায় দুই এক জাতি কলা ব্যবহার হয়, তদ্ভিন্ন সমুদায়ই পক্কাবস্থায় আদরণীয়।

কলার আবাদ অতি সহজ; বর্ষাকালে কলার ঝাড় হইতে ছোট ছোট তেউড় তুলিয়া সাত আট হাত অন্তর এক হাত গভীর গর্ত্ত খনন করিয়া রোপণ করিবে। রোপণের পূর্ব্বে সমুদায় জমি একবার কোদ্‌লাইয়া লইবে। যেস্থানে বর্ষার জল বাধে সেস্থানে চারা রোপণ করিবে না। এক বৎসরের গাছ হইলেই প্রায় ফলিতে আরম্ভ করে। এক একটা গাছের গোড়ার চারি পার্শ্বে অনেকগুলি চারা জন্মিয়া বৃহৎ ঝাড় হয়, কিন্তু এক এক ঝাড়ে ঊর্দ্ধ সংখ্যা তিনটীর বেশী গাছ রাখা কর্ত্তব্য নহে। অধিক থাকিলে গাছ নিস্তেজ হইয়া কলা খারাপ হয়, এজন্য প্রতি বর্ষায় অনেক তেউড় তুলিয়া ফেলিতে হয়।

কলার আবাদ সম্বন্ধে দুইটী প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা গেল।

(১) "আট হাত অন্তর, এক হাত বাই,
কলা পোতগে চাষা ভাই।
পুতে কলা না কেটো পাত,
তাতেই কাপড় তাতেই ভাত।"

(২) "তিনশ ষাট ঝাড় কলা রুয়ে,
থাকগে চাষা ঘরে শুয়ে।
পুতে কলা না কেটো পাত,
তাতেই কাপড় তাতেই ভাত।"

দুইটী প্রবাদই প্রায় একরূপ; বিশেষ শেষ অংশে উভয়ের অবিকল মিল আছে। কলার আবাদ যে বেশ লাভজনক, উভয় প্রবাদেই তাহার আভাস রহিয়াছে। প্রথম প্রবাদের প্রথম চরণে আট হাত অন্তর এক হাত গর্ত্ত করিয়া কলা রোপণের ব্যবস্থা রহিয়াছে। পাতা কাটা উভয় প্রবাদেই নিষেধ। বস্তুতঃ শীতকালে কলার পাতা কাটা বড় অনিষ্ট-জনক, অন্য কালে পাতা কাটায় তত অনিষ্ট দেখা যায় না, কিন্তু অধিক পাতা কাটিলে গাছের মস্তক সরু হইয়া যায়, সুতরাং মোচা ও কলা ভাল হয় না।

পেপে।

পেপে এ দেশের ফল নহে। পাপিয়া নামক দ্বীপ হইতে উহা এদেশে আনীত হইয়াছে। প্রথম প্রথম এই ফলের তত আদর ছিল না, এখন নিজগুণে ক্রমশঃ সর্ব্বত্রই আদরণীয় হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ পেপে অতি উত্তম ফল। ইহার আবাদ প্রণালী অতি সহজ, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোথাও ইহার রীতিমত আবাদ হইতে দেখি নাই। বাটীর আশ পাশে বিনা যত্নে যে দুই চারিটী গাছ জন্মে, লোকে তাহারই ফল ভোগ করে এবং তাহাই বাজারে বিক্রয় হয়। যত্নপূর্ব্বক চাষ করিলে যথেষ্ট ফল উৎপন্ন হইতে পারে। অনেক জেলায় বিশেষতঃ কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে ইহার আবাদ করিলে, প্রথম প্রথম আশ্চর্য্য লাভ হওয়ার সম্ভব।

এক বৎসরের গাছেই প্রায় ফল ধরিতে আরম্ভ হয়, তিন বৎসর পর্য্যন্ত গাছ সতেজ থাকে। গাছের প্রথম অবস্থায় ফল বড় হয়, পরে ক্রমশঃ ছোট হইয়া আইসে। এক একটী পেপেগাছের জন্য দীর্ঘে চারি হাত ও প্রস্থে চারি হাত পরিমিত স্থান আবশ্যক করিলেও এক বিঘা জমিতে ৪০০ চারি শত গাছ

জন্মিতে পারে। এক একটা সতেজ গাছে দুই শতেরও অধিক ফল ধরিতে দেখা যায়। কিন্তু অযত্ন নিবন্ধন অনেক ফল ঝরিয়া পড়ে। এজন্য প্রতি গাছ হইতে বৎসরে ২০।২৫ টীর অধিক পাকা ফল লাভ হওয়া ঘটে না। এই গাছের শিকড় অধিক মাটির নীচে যায় না। ভাসা শিকড় হয় বলিয়া গোড়ার উপরের মাটি শুকাইয়া গেলেই রসের অভাবে গাছের পাতা কটা হইয়া যায় এবং গাছ শীর্ণ হইতে থাকে। এই কারণেই অনেক ফল ঝরিয়া পড়ে। যদি রীতি-মত পেপের চাষ করিয়া শুকার সময় ক্ষেত্রে প্রয়োজন মত জল সেচনের উপায় করা যায়, তাহা হইলে গাছ সতেজ থাকে, ফল বড় হয় ও ফল প্রায় ঝরিয়া পড়ে না। এইরূপ যত্ন করিলে এক এক গাছ হইতে বৎসরে শতাধিক পাকা পেপে পাওয়া যাইতে পারে।

কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের বাজারে এক একটা বড় পেপে সাত আট পয়সা পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া থাকে। পাকা পেপের গ্রাহকও কম নহে। যদি প্রতি গাছে বৎসরে গড়ে পঞ্চাশটী করিয়াও পাকা ফল পাওয়া যায় এবং প্রত্যেক ফল গড়ে দুই পয়সার হিসাবে বিক্রয় হয়, তাহাতেও প্রতি বৎসর এক বিঘা জমির উৎপন্ন গাছ হইতে ৬২৫৲ ছয় শত

পঁচিশ টাকা আয় হইতে পারে। মালীর বেতন ও জমির খাজানায় বার্ষিক ১২৫৲ এক শত পঁচিশ টাকা খরচ হইলেও প্রতি বিঘায় বৎসর ৫০০ পাঁচ শত টাকা লাভ !! এতদ্ভিন্ন তরকারির জন্য কাঁচা পেপে বিক্রয় হইয়া থাকে।

আমরা পেপে গাছের উল্লিখিত প্রকৃতি অল্প সংখ্যক গাছ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া জানিয়াছি এবং সকলকেই পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করিতেছি। যখন সামান্য মূলধনে ও সামান্য যত্নে এরূপ অত্যধিক লাভের সম্ভাবনা, তখন অনেকেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। কিন্তু কথা এই, এরূপ লাভ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবার নহে। কারণ অর্থনীতি শাস্ত্রের নিয়ম এই, সহজ উপায়ে যে কার্য্যে লাভ বেশী, সে কার্য্য অনেকেই অবলম্বন করে; তাহাতে অধিক আমদানীর জন্য মূল্য কম হইয়া লাভের হার হ্রাস করে। কিন্তু যদি এই কারণে এরূপ একটী উপাদেয় ফল দেশ মধ্যে সুলভ হইয়া উঠে, তাহাও পরম লাভ বিবেচনা করিতে হইবে। যে যে স্থানে পেপের আদর ও কাটতি বেশী, সেই সেই স্থানেই ইহার চাষে লাভের সম্ভাবনা। কারণ তথায় বিক্রয় না হইলে, ইহা অন্যত্র চালান দেওয়ার উপযুক্ত ফল নহে।

পেপের চাষ করিতে হইলে, বর্ষাকালে গাছ পাকা ফলের বীজ টাট্‌কা অবস্থায় চারা উৎপাদনার্থ কোন স্থানে পাতো দিবে। বৃষ্টির অভাব হইলে, মৃত্তিকা সরস রাখিবার জন্য তাহাতে আবশ্যক মত জল সেচন করিবে। চারা গুলি অর্দ্ধহস্ত অপেক্ষা বড় হইয়া উঠিলে, জমিতে স্থায়ীরূপে পরস্পর চারি চারি হাত অন্তরে রোপণ করিবে। চারা রোপণার্থ সমুদায় জমি কোদলাইয়া লইবে। পরে ঐরূপ অন্তরে অন্তরে প্রত্যেক চারার জন্য এক হাত দীর্ঘ, এক হাত প্রস্থ, অর্দ্ধ হাত অপেক্ষা অধিক গভীর করিয়া গর্ত্ত করিবে ফাসমাটি অথবা পলিমাটি সামান্য মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত করিয়া গর্ত্তগুলি পূর্ণ করতঃ তথায় চারা রোপণ করিবে। এইরূপ প্রস্তুত স্থানে চারা রোপণ না করিয়া একেবারে চারি পাঁচটী করিয়া বীজ রোপণ করিয়া গেলেও হয়, তাহাতে যে চারা জন্মে তাহা আর স্থানান্তরিত করার আবশ্যক হয় না। কিন্তু এক স্থানে একটির অধিক চারা রাখিবে না।

পেপে গাছের পক্ষে পলিমাটির সার ভাল। যে দো-আঁশ মৃত্তিকায় বালির অংশ কিঞ্চিৎ বেশী, তাহা ইহার পক্ষে অধিক উপযোগী। পুষ্করিণী বা খাল কাটিলে যে নূতন মাটি উঠে, সেই মাটিতে এই গাছ উত্তম জন্মে এবং তথায় ডাব নারিকেলের

মত খুব বড় ফল হয়। বর্ষাকালে চারা স্থানান্তরিত করিলে নূতন স্থানে শীঘ্র শীঘ্র শিকড় লাগিয়া যায়। গাছের গোড়ার মাটিতে বেশী রস থাকা বা একেবারে রসের অভাব হওয়া ভাল নহে। গোড়ায় বর্ষার জল দাঁড়াইলে শিকড় পচিয়া গাছ উপড়িয়া পড়ে।

যে গাছে লম্বা শীষ বাহির হইয়া ঝাড়ের ন্যায় ফুল ধরে, সে গাছ অকর্ম্মণ্য; তাহাতে সুফল লাভের প্রত্যাশা নাই, সুতরাং তাহা কাটিয়া সেই স্থানে অন্য চারা রোপণ করা কর্ত্তব্য। অনেকের এইরূপ সংস্কার আছে যে, চারা নাড়িয়া পুতিলেই ঐরূপ অকর্ম্মণ্য গাছ জন্মে; পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, এ কথা সত্য নহে। অপর কেহ কেহ বলেন, ফলের অগ্রভাগের দিকের বীজে যে গাছ জন্মে, তাহাতেই ঐরূপ ফুল ধরে। এ কথার সত্যতাও বিনা পরীক্ষায় বিশ্বাস করা যায় না। ফলতঃ কি কারণে গাছের ঐরূপ অবস্থা হয়, তাহা অদ্যাপি স্থিরীকৃত হয় নাই।

ইক্ষু।

যে ভূমি বন্যার জলে ডুবিবার সম্ভাবনা নাই, সেই ভূমিই ইক্ষুর পক্ষে উপযুক্ত। ঐ স্থানের মৃত্তিকা দো-আঁশ হইলে ভাল হয়। চৈত্র ও বৈশাখমাসে লাঙ্গল দ্বারা চারি পাঁচবার চাষ দিয়া ক্ষেত্র উত্তমরূপে পাইট করিবে। পাইট করিবার সময় মৃত্তিকার সহিত খৈল ও গোময় সার মিশাইবে। মৃত্তিকা প্রস্তুত হইলে, এক এক হাত অন্তরে অর্দ্ধহস্ত চৌড়া এবং অর্দ্ধহস্ত গভীর করিয়া জুলি প্রস্তুত করিবে। জুলি খুঁড়িতে যত মাটি উঠিবে, তাহা প্রতি দুই জুলির মধ্যে আইলের আকারে রাখিবে; কারণ তাহা হইলে পরে ইক্ষুর গোড়ায় মাটি দেওয়ার সময় ঐ মাটি সহজে লওয়া যাইতে পারিবে।

এই প্রকারে জমি প্রস্তুত হইলে, জুলির মধ্যে এক এক হাত অন্তরে ইক্ষুর ডগা পাতিয়া বসাইবে। প্রত্যেক ডগায় অন্ততঃ তিনটী চোক্ থাকা আবশ্যক। সেই চোক উপরের দিকে রাখিয়া তদুপরি আড়াই অঙ্গুল পুরু করিয়া এরূপে মাটি চাপা দিবে যে সমুদায় ডগাটি যেন ঢাকিয়া যায়। মাটি চাপা দেওয়া হইলে, তৎক্ষণাৎ জল সেচন করিবে। ডগা রোপণের পূর্ব্বে

জুলির মধ্যে অতি পাতলারূপে খৈলের গুড়া ছড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক।

কোঁড়ক বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত দুই তিন দিন অন্তর জল সেচন করিবে। কোঁড়কগুলি সম্যক্‌-প্রকারে জন্মিলে, বার তের দিন অন্তর জল দিলেই হইবে এবং তখন সিঞ্চিত জল একটু টানিয়া গেলে, পার্শ্বস্থ আইলের মৃত্তিকা খুঁড়িয়া দিতে হইবে, তাহাতে পুনরায় জল সেচন করিলে বা বৃষ্টি হইলে ঐ মৃত্তিকা ধৌত হইয়া জুলির মধ্যে পড়িবে; সুতরাং চারার গোড়ায় মৃত্তিকা দেওয়ার কাজ হইবে। ভাদ্রমাস পর্য্যন্ত এইরূপ করিতে হইবে। আশ্বিনমাসে আইল সকলে যে মৃত্তিকা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা খুঁড়িয়া সমান করিয়া দিবে, অর্থাৎ তখন আর আইল রাখিবে না। এই সময়ে ক্ষেত্রে একবার খৈল ছড়ান আবশ্যক। ইহার পর পোনের বা কুড়ি দিন অন্তর জল সেচন প্রয়োজন হয়। জল সেচনের দুই এক দিন পরে মৃত্তিকা অল্প অল্প খুঁড়িয়া দিবে।

চারাগুলি যখন এক হাত পরিমাণে বড় হইবে, তখন অবধি নীচের পাতাদ্বারা তাহাদিগকে জড়াইতে আরম্ভ করিবে এবং গাছ ক্রমে যত বাড়িবে, তত জড়াইয়া দিবে। বাতাসে হেলিয়া পড়িতে না পারে তজ্জন্য বড় বড় তিন চারিটি গাছ পাতা দিয়া একসঙ্গে বান্ধিয়া দিবে।

ইক্ষুর যে সকল ডগা রোপিত হইয়া থাকে, রোপণের পূর্ব্বে তাহাদিগকে হাপোরে ফেলিয়া রাখিতে হয়। হাপোরে রাখার নিয়ম এই,—কোন স্থানে এক হস্ত গভীর একটী গর্ত্ত করিবে। যত ডগা রাখিবে, তাহা ধরিবার উপযুক্ত গর্ত্তের আয়তন করিবে। অনন্তর পুকুরের পাঁক, ছাই ও বালি মিশ্রিত করিয়া উহার গর্ত্তের কিয়দংশ পূর্ণ করিবে। এইরূপে হাপোর প্রস্তুত হইলে ইক্ষুর ডগা সকল তন্মধ্যে অল্প হেলাইয়া সাজাইয়া বসাইবে। তৎপরে তাহাদের চারিপার্শ্ব মৃত্তিকাদ্বারা এরূপে ঢাকিয়া দিবে যে, গোড়ায় বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে কিন্তু এই মৃত্তিকার আবরণ যেন ডগার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত না উঠে অর্থাৎ উপরের কিয়দংশ বাকি রাখিয়া ডগাগুলি মৃত্তিকাবৃত করিবে। অনন্তর রোপণের উপযুক্ত সময় হইলে, ডগাগুলিকে এই স্থান হইতে উঠাইয়া, পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ক্ষেত্রে রোপণ করিবে।

শামসাড়া ইক্ষুদণ্ডের দুই দুইটী গাঁইট বিশিষ্ট এক এক খণ্ড পূর্ব্বোক্ত নিয়মে রোপণ করিলেও উত্তম চারা জন্মে। মাঘ বা ফাল্গুনমাসে কৃষকেরা ইক্ষু কাটিয়া তাহার অধিকাংশ ইক্ষুদ্বারা গুড় প্রস্তুত করে, ইক্ষুর আবাদ করিলে এক বিঘা জমিতে খরচ বাদে প্রায় পঞ্চাশটাকা লাভ হয়।

গোল-আলু।

গোল-আলু অতি উৎকৃষ্ট তরকারি; ইহার পুষ্টি-কারিতা শক্তি এত অধিক যে, কোন কোন দেশের লোকে কেবল আলু খাইয়া জীবন ধারণ করে। ইহার আবাদে লাভও অনেক, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, আজও বঙ্গদেশের সকল স্থানে ইহার আবাদ আরম্ভ হয় নাই। ফরিদপুর, যশোহর, খুলনা প্রভৃতি অনেক জেলার লোকের সংস্কার এই যে, ঐ সকল স্থানের মৃত্তিকায় আলু জন্মিতে পারে না। এই সংস্কার বশতঃ তত্রত্য লোকে আলু জন্মাইতে একবারে উদাসীন। আমরা বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা জানিয়াছি, রীতিমত চাষ করিলে, চব্বিশপরগণা, হুগলি, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানের ন্যায় ঐ সকল স্থানেও বিস্তর আলু জন্মিতে পারে। যাঁহারা আমাদের কথার সত্যতা পরীক্ষা করিতে চান, তাঁহাদিগকে আমরা অনুরোধ করি যে, উক্ত ভ্রমসংস্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক নিয়ম মত ইহার আবাদে প্রবৃত্ত হউন; তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, ইহা কেমন জন্মে এবং ইহার আবাদে কেমন লাভ হয়।

কঙ্করাদি শূন্য হাল্‌কা নূতন পলিপড়া ভূমি, আলুর পক্ষে অত্যুত্তম। এরূপ ভূমিতে সার না দিলেও

আলুর গাছ অতিশয় বাড়িয়া উঠে এবং ফসল অধিক হয়। দো-আঁশ মৃত্তিকায় আলু জন্মাইতে হইলে, আশ্বিন মাসে ভূমি খননপূর্ব্বক তাহাতে চূণ, বালি, খৈল ও পচাপাতার সার দিবে। এই সকল সার একবারে সংগ্রহ না হইলে পলিমাটি, খৈল ও গোবরের সার যথেষ্ট পরিমাণে দিবে। অস্থিচূর্ণের সার আলুর পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। যদি মাঘ বা ফাল্গুন মাসে ক্ষেত্রে শুষ্ক ডোবা বা পয়নালা হইতে পলিমাটি তুলিয়া একবার লাঙ্গল দিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে আশ্বিন মাসে আর কোন সার না দিয়া কেবল খৈলের সার দিলেই আলু উত্তম জন্মে। যে স্থানের মৃত্তিকা বারমাস ভিজা থাকে,তথায় আলু জন্মে না; এজন্য নাবাল জমিতে ইহার আবাদ করা উচিত নহে।

ক্ষেত্রের মৃত্তিকা প্রায় এক হস্ত গভীর করিয়া খননকরতঃ খনিত মৃত্তিকা ধূলার মত চূর্ণ করিবে। মৃত্তিকা যত অধিক খনিত ও চূর্ণিত হইবে, ততই ফসল ভাল জন্মিবে। অতঃপর এক এক হস্ত অন্তরে উত্তর দক্ষিণে লম্বা জুলি প্রস্তুত করিবে। জুলির গভীরতা অর্দ্ধ হস্ত হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক জুলির মধ্যে ১৫।১৬ অঙ্গুল ব্যবধানে এক একটী বীজ-আলু বসাইবে। বীজ রোপণ সময়ে যে দিকে অধিক চোক্ থাকিবে, সেই দিক উপরে রাখিয়া

মাটি চাপা দিবে। মাটি চাপা দেওয়ার সময় সতর্ক থাকিবে, যেন অঙ্কুরের কোন ব্যাঘাত না ঘটে। বীজের উপর চারি ক্রুলের অধিক মাটি চাপা দেওয়ার আবশ্যক নাই। বর্ষা শেষ হইলে আশ্বিন মাসের শেষে বীজ রোপণ করা যাইতে পারে; নতুবা কার্ত্তিক মাসের প্রথমে রোপণ করিবে। যাবৎ অঙ্কুর বাহির না হয়, তাবৎ প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে বীজের উপর অল্প পরিমাণে জল ছিটাইয়া দিবে। অধিক জল দিলে অনিষ্ট হইবে।

বীজে যতগুলি চোক্ থাকে, প্রায় সকলগুলি হইতে অঙ্কুর বাহির হইয়া এক একটা বীজে এক এক ঝাড় চারা জন্মে; তন্মধ্যে নিস্তেজগুলি ভাঙ্গিয়া দিলে অবশিষ্টগুলি অত্যন্ত তেজাল হইয়া উঠিবে। চারা পাঁচ ছয় অঙ্গুলি বাড়িয়া উঠিলে, একবার সমস্ত জমিতে উত্তমরূপে জল সেচিয়া দিবে এবং ঐ জল টানিয়া যখন মাটিতে "যো" হইবে, তখন মাটি খুঁড়িয়া হাতে গুড়া করিয়া সেই মাটি চারার গোড়ায় চাপিয়া দিবে। আট নয় দিন অন্তর এইরূপ জল সিঞ্চন করিবে ও মাটি খুঁড়িয়া চারার গোড়ায় দিবে। ক্রমান্বয়ে এইরূপ করিলে পার্শ্বের দাঁড়াগুলি জুলির মত হইবে এবং চারার গোড়ার মাটি প্রথম রোপণের স্থান অপেক্ষা পোনের ষোল অঙ্গুল উচ্চ হইবে। ত্রিহুত ও

আরা জেলায় বার চৌদ্দবার জল সেচনের প্রয়োজন হয়, কিন্তু আমাদের দেশে চারিবার জল সেচন করিলেই যথেষ্ট হইয়া থাকে।

রীতিমত পাইট হইলে, দেড় বা পৌনে দুই মাসের মধ্যেই আলু খাইবার যোগ্য হয়। অগ্র-হায়ণের শেষে বা পৌষ মাসের প্রথমে আলু তোলা যাইতে পারে। আলু তুলিবার জন্য কোন অস্ত্র ব্যবহার না করিয়া বিদাকাটি ব্যবহার করিবে, অথবা হাত দিয়া তুলিবে। প্রথমবার বড় বড় আলুগুলি তুলিয়া লইবে এবং ছোট আলু সমেত গাছের গোড়া পুনরায় মৃত্তিকা দ্বারা উত্তমরূপে ঢাকিয়া দিবে। ইহার তিন চারি দিন পরে একবার জল সিঞ্চন করিবে, তাহাতে গাছের তেজ পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইবে।

মাঘমাস দ্বিতীয়বার ফসল তুলিবার উপযুক্ত সময়। এই সময়ে সমুদায় আলু একবারে তুলিয়া ফেলিতে হয়। এক ভূমিতে এক ক্রমে দুই বৎসর আলুর আবাদ করিলে, প্রথম বৎসর অপেক্ষা দ্বিতীয় বৎসরের ফসল বড় হয়। মাঘমাসের প্রাপ্ত ফসল হইতে লোকে বীজের জন্য ছোট ছোট আলু রাখে। বীজের নিমিত্ত ছোট আলু রাখা সুবিধাজনক বটে, কারণ ছোট আলু শীঘ্র পচে না, কিন্তু ছোট বীজ, ফসল বড়

হওয়ার পক্ষে বিঘ্নকর। ঈষৎ অপক্ক লম্বাকৃতির আলু, বীজের জন্য রাখিলে গাছ অতিশয় তেজাল ও ফসল অনেক বড় হয়। সাধারণতঃ তিন চারিটা চোক-বিশিষ্ট মধ্যম পরিমাণের আলু বীজরূপে গণ্য হইতে পারে। বীজ যত্নপূর্ব্বক না রাখিলে অধিকাংশ পচিয়া নষ্ট হয়। যে ঘরে বায়ু উত্তমরূপ খেলে, সেই ঘরের মধ্যে মাচা প্রস্তুত করিয়া তদুপরি শুষ্ক বালি ছড়াইবে এবং সেই বালির উপর বীজ আলুগুলি ছড়াইয়া রাখিবে। এত যত্নে রাখিলেও কতক বীজ নষ্ট হয় কিন্তু অধিকাংশ ভাল থাকে।

সচরাচর যে ক্ষুদ্র আলু বীজের জন্য রাখা হয়, তাহার সোয়া বা দেড় মণ হইলেই এক বিঘা জমির আবাদ হইতে পারে, কিন্তু মধ্যমাকৃতির লম্বা আলু বীজের জন্য রাখিলে, তাহার চারি পাঁচ মণ প্রতি বিঘায় দরকার হয়। ইহাতে বীজ কিছু বেশী ওজনের লাগিলেও ফসলে লাভ ভিন্ন লোকসান হয় না। কারণ ছোট বীজের আবাদ অপেক্ষা বড় বীজের আবাদে দ্বিগুণেরও অধিক ফসল পাওয়া যায়। ছোট বীজ লইয়া আবাদ করিয়া এদেশের কৃষকেরা বিঘা প্রতি ৫০।৬০ মণের অধিক আলু পায় না কিন্তু উৎকৃষ্ট বড় বীজ লইয়া বিশুদ্ধ প্রণালীতে আবাদ করিলে, এক বিঘা জমিতে এক শত মণেরও অধিক

আলু জন্মে। যাঁহারা বড় বীজ লইয়া আবাদ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা ক্ষেত্র মধ্যে সোয়া হাত অন্তর জুলি প্রস্তুত করিয়া সেই জুলির মধ্যে দেড় হাত অন্তর বীজ রোপণ করিবেন।

বৃহদাকার বীজের এক এক ভাগে দুই তিনটী চোক্ থাকে এরূপে কাটিয়া রোপণ করিলেও চারা হয় কিন্তু এদেশে কাটিয়া রোপণ করা অপেক্ষা অখণ্ড বীজ রোপণে অধিক ফসল জন্মে। খণ্ড খণ্ড করিয়া পুতিলে অঙ্কুর বাহির হইবার অগ্রে প্রায় ঐ সকল খণ্ড শুষ্ক হইয়া যায় এবং পোকায় ধরে।

আলুর আবাদে সচরাচর কৃষকেরা বিঘা প্রতি সমুদায় খরচ বাদে ঊর্দ্ধ সংখ্যা পঞ্চাশ টাকা লাভ করে কিন্তু ভাল বীজ লইয়া আবাদ করিলে, ঐ লাভের হার অনেক বৃদ্ধি হইতে পারে।

বৈশাখী ও কার্ত্তিকে চাষের ফসল।

দেশীয় সমস্ত ফসলের আবাদ প্রণালী এই ক্ষুদ্র পুস্তকে প্রকাশ করা সম্ভব নহে। এজন্য ধান্যাদি কয়েক প্রকার অতি প্রয়োজনীয় শস্যের এবং পাট তামাকাদি অত্যন্ত লাভজনক কয়েক প্রকার পদার্থের আবাদ প্রণালীমাত্র বর্ণিত হইল। অতঃপর অন্যান্য

ফসল যে যে সময়ে উৎপন্ন করিতে হয়, তাহা উল্লেখ করা যাইতেছে।

বর্ষার পূর্ব্ব ও বর্ষার অন্ত এই দুইটী সময় এদেশে শস্যাদির বীজ বপন বা রোপণ করিবার মুখ্যকাল। যে সকল ফসলের আবাদ জন্য বৃষ্টির জলের সাহায্য আবশ্যক, তাহাদের বীজ বর্ষা আরম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বে অর্থাৎ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে রোপণ করিতে হয়। আর যাহাদের দেহ পোষণ জন্য বৃষ্টির সাহায্য আবশ্যক করে না, রৌদ্র ও শিশিরেই যাহারা সুন্দর বৃদ্ধি পায়, তাহাদের বীজ বর্ষার অন্তে অর্থাৎ কার্ত্তিকমাসে রোপণ করিতে হয়। প্রথমোক্ত প্রকার ফসলকে বৈশাখী চাষের ফসল এবং শেষোক্ত প্রকার ফসলকে কার্ত্তিকে চাষের ফসল কহে।

বৈশাখী চাষে নানাপ্রকার ধান্য, ভুট্টা, তিল, অরহর, ভুরা, ডেঙ্গোডাটা, নটেশাক, এরারুট, আদা, হলুদ, মেটেআলু, শাকআলু, পেপে, কলা, কচু, ওল, লঙ্কামরিচ, পান, লাউ, কুম্‌ড়া, কাঁকুড়, শশা, ঝিঙ্গে, করলা, বেগুণ, ইক্ষু, পাট, শণ, প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এই সকল ফসলের বীজ বৈশাখমাসে রোপণ বা বপন করিবে। কিন্তু বৃষ্টির সুবিধা কিংবা অসুবিধা হেতু বৈশাখের এক মাস পূর্ব্বে বা পরেও উহাদের আবাদ আরম্ভ হইতে পারে। বৈশাখের পূর্ব্বে আবাদ

চলিলে, ফসল অগ্রিম এবং পরে চলিলে, ফসল নাবি হইয়া থাকে। সুযোগ পাইলে অগ্রিম ফসল উৎপন্ন করিতে অবহেলা করা উচিত নহে। কারণ অগ্রিম ফসলে লাভ বেশী। ফসল নাবি হইলে ফলন কম হয়।

কার্ত্তিকে চাষে—যব, গম, ছোলা, মটর, মুগ, মুসুরী, খেঁসারী, সরিষা, তিসি, মৌরী, ধনে, কাল-জিরে, যোঁয়ান, মেথি, সুল্পা, কুসুমফুল, কার্পাস, তামাক, তর্ম্মুজ, ফুটী, কাঁকুড়, ভুয়েশশা, পেঁয়াজ, রসুন, পটল, উচ্ছে, বিলাতী কুম্‌ড়া, বান্ধাকপি, ফুল-কপি, ওলকপি, বীটপালং, গাজর, শালগম, মূলা, চাঁপা-নটে, পালং, টক্‌পালং, গোলআলু, রাঙ্গাআলু, চীনের-বাদাম প্রভৃতির বীজ রোপণ বা বপন করিতে হয়। এদেশে আশ্বিন মাসেই প্রায় বর্ষার শেষ হয়, এজন্য কার্ত্তিক মাসেই ঐ সকল বীজ রোপণ করিবার প্রশস্ত সময়। তবে ভাদ্রমাসে বর্ষার শেষ হইলে, আশ্বিন মাসে ইহাদের অগ্রিম আবাদ আরম্ভ হইতে পারে; বর্ষা, কার্ত্তিকমাস ব্যাপী হইলে অগত্যা অগ্রহায়ণ মাসে নাবি আবাদে প্রবৃত্ত হইতে হয়।

উদ্যানের কার্য্য।

শস্য ক্ষেত্রের কার্য্যে বিস্তর কষ্টস্বীকার ও পরিশ্রম করিতে হয়। উদ্যানের কার্য্যে সেরূপ পরিশ্রম নাই। বড় বড় ফল-বৃক্ষের চারা যখন রোপণ করিতে হয়, তখনই যত্ন ও সাবধানতার প্রয়োজন; সে সাবধানতার কথা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এখন উদ্যানের কার্য্য সম্বন্ধে বিশেষ কয়েকটি কথা বলিব। গাছ বড় হইয়া উঠিলে, বর্ষাকালে গোড়ার চারিদিকে আইল বান্ধিয়া বর্ষার জল খাওয়াইতে হয়, তৎপরে কার্ত্তিক মাসে সেই আইল ভাঙ্গিয়া দিয়া সারমিশ্রিত নূতন মাটি দ্বারা গোড়া ঢাকিয়া দিতে হয়, তাহা হইলেই অধিকাংশ ফল-গাছ সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য এক প্রকার শেষ হইয়া থাকে।

বাগানের মাটি কার্ত্তিক মাসে একবার কোদলাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। যদি কোন গাছের গোড়ায় বর্ষাকালে গর্ত্ত হইয়া জল বসে, তবে তাহা নিবারণ করিবে। বেল, যুঁই, মল্লিকা প্রভৃতি ফুলের গাছ শ্রাবণ মাসে ছাটিয়া দিবে। গোলাপের গাছ কার্ত্তিক মাসে ছাটিবে এবং সেই সময়েই তাহার ডাল পুতিয়া শাখা-কলম করিবে। অন্যান্য ফুল-

গাছের শাখা-কলম বর্ষাকালে করিবে। আম কাঠালাদি ফলের বীজ বর্ষাকালেই রোপণ করিয়া চারা জন্মাইতে হয়।

আজকাল বীজোৎপন্ন চারা অপেক্ষা কলমের চারার আদর বেশী। কলমের চারার আদর হওয়ার কারণ এই,—ইহাতে অল্পদিনে ফল ধরে এবং ফল যেরূপ জনকবৃক্ষের অনুরূপ হয়, বীজের চারায় প্রায় সেরূপ হয় না। কলমের চারার দোষও আছে। ইহা বীজোৎপন্ন চারার ন্যায় দীর্ঘকাল ফলপ্রসবে সমর্থ নহে এবং বীজের গাছে যেমন প্রচুর ফল ধরে, কলমের চারায় সেরূপ ধরে না।

বর্ষার প্রারম্ভ বা শরৎকাল কলমের চারা উদ্যানে রোপণ করিবার উপযুক্ত সময়। এদেশে যোড়-কলম ও গুল কলম করিয়া অধিকাংশ ফল-বৃক্ষের চারা প্রস্তুত হয়। এই দুই কলম করিবার নিয়ম নিম্নে লিখিত হইতেছে।

যোড়-কলম।

কোন চারার কাণ্ডের সহিত তাহার স্বজাতীয় বৃক্ষের শাখায় যোড় লাগাইয়া যে কলম প্রস্তুত হয়, তাহাকে যোড়-কলম কহে। আম, জাম, লেবু,

গোলাপ, স্থলপদ্ম প্রভৃতি অনেক বৃক্ষে এই কলম করা যাইতে পারে। কিন্তু যে গাছে কলম করিবে, চারাটি সেই জাতীয় বৃক্ষের হওয়া আবশ্যক নতুবা যোড় লাগে না।

যে চারা লইয়া যোড়কলম করিবে, পূর্ব্বে তাহাকে টবে বা গামলায় রাখিয়া কিছুদিন প্রতিপালন করিতে হইবে। কারণ টবে বসাইয়া সদ্য কলম বান্ধিলে চারা মরিয়া যাওয়ারই বেশী সম্ভব। পরিপুষ্ট সতেজ চারা হইলে, কলম ভাল হয়। যে বৃক্ষে কলম বান্ধিবে, তাহার এমন একটি শাখা মনোনীত করিবে যে, তাহা রুগ্ন না হয় এবং তাহার স্থূলতা চারার কাণ্ডের সমান হয়। নিস্তেজ ও রুগ্ন শাখা হইলে, সে কলমে শীঘ্র ফল ফুল ধরে না। চারার কাণ্ড অপেক্ষা শাখা অধিক মোটা হইলে, যোড় লাগিতে পারে; কিন্তু পরে তাহা স্থূল শাখার উপযুক্ত রস যোগাইতে না পারিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। শাখা অপেক্ষা চারার স্থূলতা বেশী হইলে কোন হানি হইবে না, বরং কলম ভাল হইবে।

যে শাখাটী মনোনীত হইল, টব সমেত চারাটীকে কোন উপায়ে সেই শাখার নিকট স্থাপন কর এবং উভয়কে উভয়ের দিকে নোয়াইয়া একত্রে ধরিয়া দেখ যে, চারার কোন অংশের সহিত শাখার কোন্ অংশ

ভালরূপ যোড় বান্ধা যাইতে পারে; চারার একেবারে মস্তকের দিকে যোড় বান্ধা কর্ত্তব্য নহে; কারণ মস্তকের দিকে যোড় থাকিলে যখন কলম নামাইয়া জমিতে রোপণ করিবে, তখন বাতাসে সঞ্চালিত হইয়া, যোড়স্থানে আঘাত লাগিতে পারে; তাহাতে কলম নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

চারা ও শাখার যে যে অংশে যোড় বান্ধিবে স্থির করিলে, প্রত্যেকের সেই সেই অংশ হইতে অন্যূন চারি অঙ্গুল দীর্ঘ ও স্থূলতার তৃতীয়াংশ পরিমাণ কাষ্ঠের সহিত ছাল ছুরী দ্বারা তুলিয়া এরূপ পরিষ্কার করিবে, যেন যোড় বান্ধিলে অন্ততঃ তিন অঙ্গুল স্থানে কিছুমাত্র ফাঁক না থাকে। অনন্তর উভয়ের ঐ অংশদ্বয়কে সম্মিলন করতঃ একগাছি দীর্ঘকালস্থায়ী সূক্ষ্ম রজ্জু দ্বারা জড়াইয়া বান্ধিবে। তাহাহইলেই কিছু দিন পরে ঐ স্থানে যোড়া লাগিয়া যাইবে। কত দিনে যোড়া লাগিবে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। কোন কোন বৃক্ষে দেড় বা দুই মাসেই ভাল যোড় লাগে; আবার কোন কোন্ বৃক্ষে চারি পাঁচ মাসের কমে যোড় লাগে না। বর্ষাকালে আম্রের যোড় কলম বান্ধিলে দুই মাসের মধ্যেই যোড় লাগিয়া থাকে।

উত্তম যোড় লাগিলে, যোড়ের নিম্ন ভাগে শাখা ছেদন করিয়া কলম নাবাইবে এবং কিছু দিন

পরে চারার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিবে। চারার মস্তক ছেদন না করিলে, চারায় ও শাখায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ফল প্রসব করিবে। কিন্তু তাহাতে সংলগ্ন শাখা সতেজ হইতে পারে না, সুতরাং যোড় কলমের উদ্দেশ্যও সফল হয় না।

উপরে একটী গোলাপ গাছের প্রতিরূপ দিয়া যেরূপে যোড় কলম বান্ধিতে হয়, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার দক্ষিণ পার্শ্বের শাখায় (খ) চিহ্নে

যেরূপ কাটা আছে, শাখা ও চারার যোড়ের স্থান সেইরূপ কাটিতে হইবে এবং বাম পার্শ্বে ক চিহ্নিত স্থানে উভয়কে সম্মিলনপূর্ব্বক যেরূপ বন্ধন করা হইয়াছে, সেইরূপ বান্ধিবে। যোড়কলম সকল সময়েই করা যাইতে পারে, কিন্তু অন্য সময় অপেক্ষা বর্ষাকালে অল্পদিনে যোড় লাগে। যে বৃক্ষের শাখার সহিত যোড়-কলম করিবে, ফুল ফলের দোষগুণও সেই বৃক্ষের অনুরূপ হইবে, চারার সহিত এই দোষগুণের কোন সম্বন্ধ নাই।

গুলকলম।

সকলেই দেখিয়াছেন যে, শাখার যে স্থান হইতে পত্র উৎপন্ন হয়, সেই স্থানে গ্রন্থি অর্থাৎ গাঁইটের মত চিহ্ন হয়। শাখা বর্দ্ধিত হইলে, গোড়ার দিকের পত্রগুলি পড়িয়া যায়, কিন্তু পত্র পড়িয়া গেলেও গ্রন্থির চিহ্ন থাকে। ঐ চিহ্ন কোন কোন বৃক্ষে স্পষ্ট লক্ষিত হয়, আর কোন কোন বৃক্ষে তত স্পষ্ট দেখা যায় না, একটু অভিনিবেশ পূর্ব্বক অনুসন্ধান

করিলেই জানিতে পারা যায়। উক্ত গ্রন্থি, পত্রগ্রন্থি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দুই পত্র-গ্রন্থির মধ্যবর্ত্তী স্থানকে পর্ব্ব অর্থাৎ পাব বলে।

গুলকলম করিতে হইলে, বৃক্ষের একটী সতেজ শাখা মনোনীত করিবে। ঐ শাখার তিন চারি অঙ্গুলি দীর্ঘ কোন পর্ব্বের চারিদিকের ছাল কিঞ্চিৎ কাষ্ঠের সহিত ছুরীদ্বারা চাঁছিয়া ফেলিবে। ছাল যেন পর্ব্বের উভয় পার্শ্বস্থ পত্রগ্রন্থি ছাড়াইয়া না উঠে। ছাল তুলিবার পূর্ব্বে পর্ব্বের নিম্নস্থ পত্রগ্রন্থির উপরে এবং উপরিস্থিত পত্রগ্রন্থির নিম্নে শাখা বেষ্টন পূর্ব্বক ছুরিদ্বারা গোলাকারে দাগ দিবে, তাহা হইলে গ্রন্থি ছাড়িয়া ছাল উঠিবে না। পর্ব্বের ছাল তোলা হইলে, এক দলা নরম সারমাটি দুই ভাগ করিয়া দুই হস্তে লইয়া ঐ পর্ব্বের উপরে ও নীচে লাগাইবে এবং পরে তাহা চারিদিকে সমানরূপে চাপিয়া দিবে, যেন কোন পার্শ্বে ফাক না থাকে। অতঃপর ছেড়া চট বা নারিকেলের ছোবড়া দ্বারা মৃত্তিকার চতুষ্পার্শ্ব বেষ্টন করিয়া শোণ বা তাদৃশ শক্ত সূত্রদ্বারা জড়াইয়া রাখিবে। ঐ মাটি সর্ব্বদা সরস রাখার জন্য উপরে সচ্ছিদ্র ভাঁড় ঝুলাইয়া যাহাতে নিয়ত বিন্দু বিন্দু জল তাহাতে পড়ে এরূপ বিধান করিবে। বর্ষাকালে এই কলম করিলে, ভাঁড় ঝুলাইবার আবশ্যক হয় না।

কলমের স্থানে শিকড় বাহির হইতে বৃক্ষবিশেষে এক হইতে চারি মাস পর্য্যন্ত সময় লাগে।

ক

শিকড় বহির্গত হইলে অতি ধীরে ধীরে শাখার যে স্থানে কলম বান্ধা গিয়াছে, তাহার নিম্নভাগে কাটিয়া, চারা-টীকে কিছুদিন হাপোরে বসাইয়া রাখিবে। তথায় একটু সবল হইলে উদ্যানে রোপণ করিবে। কাটিবার সময় অধিক ঝাকি লাগিলে চারার অনিষ্ট সম্ভব। স্থূল শাখায় এই কলম বান্ধিলে শীঘ্র শিকড় বাহির হয় না।

পার্শ্বে যে চিত্র দেওয়া গেল, তাহার (ক) চিহ্নিত স্থানের ন্যায় শাখার দুই পত্র গ্রন্থির মধ্যস্থ পর্ব্ব ভাগের ছাল কিয়দংশ কাষ্ঠের সহিত তুলিতে হইবে। সকল সময়েই এই কলম করা যাইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বর্ষাকালে সহজে চারা প্রস্তুত হয়। আম, জাম, নিচু, লেবু, পেয়ারা প্রভৃতি অনেক বৃক্ষে এই কলম করা যাইতে পারে।

পরিশিষ্ট।

আদর্শ-প্রশ্ন।

১। কৃষিকার্য্যে কাহাকে বলে? কৃষিকার্য্যের প্রয়োজনীয়তা কি?

২। এদেশে কৃষির উন্নতি নাই কেন? কি হইলে উন্নতি হইতে পারে?

৩। মৃত্তিকা কয় প্রকার? প্রত্যেক প্রকারের লক্ষণ লিখ?

৪। কোন্ প্রকার উদ্ভিজ্জের পক্ষে কিরূপ মৃত্তিকা উপযোগী এবং কোন্ মৃত্তিকা সর্ব্বপ্রকার উদ্ভিজ্জের পক্ষেই উপযোগী।

৫। ক্ষেত্র কয় প্রকার? প্রত্যেক প্রকারের লক্ষণ লিখ। উচ্চ ভূমির মধ্যে কোন্ প্রকার ক্ষেত্র উৎকৃষ্ট? জোল ও বিল জমি কোন্ শস্যের পক্ষে অধিক উপযোগী?

৬। অনুর্ব্বরা ভূমির সাধারণ লক্ষণ কি?

৭। বীজ রোপণের জন্য কোন্ কোন বিষয়ে সাবধানতার প্রয়োজন? কোন্ কোন্ দোষ ঘটিলে বীজে অঙ্কুর জন্মে না?

৮। শিকড়ের কার্য্য কি? শিকড়ের কোন্ অংশ ভূমির রসাকর্ষণে পটু?

৯। উদ্ভিজ্জের কাণ্ড কাহাকে বলে? আলু, মূলা, শালগাম্, বীট্ প্রভৃতির কাণ্ড মৃত্তিকায় আচ্ছাদিত থাকিলে সুন্দর বৃদ্ধিপায় কেন?

১০। পত্রদ্বারা উদ্ভিজ্জদিগের কোন্ কা[illegible] হয়? যদি কোন কারণে গাছের সমস্ত পাতা নষ্ট হয়, তবে গাছ মরিয়া যায় কেন? শীত বা শরৎ কালে কোন কোন গাছের সমস্ত পাতা এক সময়ে পড়িয়া যায়, তথাপি তাহারা কিরূপে বাঁচিয়া থাকে?

১১। ফল ও পুষ্প বৃক্ষের চারা তুলিয়া স্থানান্তরে রোপণ করিতে হইলে, কোন্ ঋতু প্রশস্ত? চারা রোপণ সময়ে কোন্ কোন্ বিষয়ে সাবধান হইতে হয়?

১২। চারা ঘন ঘন রোপণ করিলে ক্ষতি কি? আম্রাদি বৃহৎ বৃক্ষের চারা পরস্পর কত হাত অন্তরে রোপণ করা উচিত?

১৩। চাষ শব্দের অর্থ কি? জমিতে চাষ দেওয়ার উদ্দেশ্য কি?

১৪। বিলাতী লাঙ্গল আমাদের দেশের পক্ষে উপযোগী কি না, কারণ সহ লিখ।

১৫। ক্ষেত্র কর্ষণের সুযোগ কখন হয়? ঐ সুযোগকে কৃষকেরা কি বলে? পতিত জমিতে চাষ দেওয়ার নিয়ম কি? ভূমির পাইট কাহাকে বলে?

১৬। কোন্ জাতীয় ফসল উৎপন্ন করিতে কিরূপ চাষের আবশ্যক, তৎসম্বন্ধে যে একটী কৃষি-প্রবাদ আছে, তাহা উল্লেখ কর।

১৭। জমিতে সার দেওয়ার উদ্দেশ্য কি? সচরাচর কোন কোন্ পদার্থ সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে?

১৮। সার কয় প্রকার? অস্থি, গোময়, খৈল ও চূর্ণ ইহাদের কোন্‌টী কোন প্রকার সার? ইহাদিগকে ক্ষেত্রে দেওয়ার নিয়ম কি? উদ্ভিজ্জ সার কিরূপে প্রস্তুত হয়?

১৯। ধান্য, ইক্ষু, তামাক, মানকচু ও গোল-আলু, ইহাদের কোন্‌টীর জন্য কোন্ প্রকার সার ভাল? লবণ সার কোন্ উদ্ভিজ্জের পক্ষে উপযোগী? ক্ষেত্রে সারের পরিমাণ বেশী হইলে কি দোষ হয়?

২০। জল সিঞ্চনের আবশ্যকতা কি? শাকসব্জির ক্ষেত্রে ও ফলবৃক্ষের মূলে জল সিঞ্চন করিবার নিয়ম কি? টবে বা গামলায় বীজ রোপণ করিয়া কি প্রণালীতে জল দেওয়া উচিত? দিবসের কোন্ সময়, জল সিঞ্চনের জন্য প্রশস্ত?

২১। আকাশের অবস্থা দেখিয়া বৃষ্টির সম্ভাবনা বুঝিবার যে কৃষি প্রবাদ আছে, তাহা উল্লেখ কর।

২২। শাক সব্জি ও ফলের বাগানের জন্য কিরূপ স্থান মনোনীত করিবে? শজিনা, মাদার প্রভৃতি বৃক্ষের দ্বারা বাগানের বেড়া দিলে কি অপকার হয়?

২৩। এদেশের প্রচলিত কৃষিযন্ত্র গুলির নাম কর এবং যে যন্ত্রদ্বারা যে কার্য্য হয় তাহাও উল্লেখ কর।

২৪। ধান্য কয় শ্রেণীতে বিভক্ত? আশু ধান্য উৎপাদনের নিয়ম লিখ। ধানে চিটে পড়ে কেন?

২৫। আশু ও আমোন ধান্যের আবাদ প্রণালীতে কি পার্থক্য আছে? যে নিয়মে বৃষ্টি হইলে, আমোন ধান্যের পক্ষে সুবিধা হইতে পারে, তৎসম্বন্ধীয় কৃষি-প্রবাদটী লিখ।

২৬। যব, গম, ছোলা ও সরিষা ইহাদের আবাদ প্রণালী বর্ণন কর। কোন্ কোন্ শস্যের বীজের সহিত এক সঙ্গে যবের বীজ বপন করা যাইতে পারে?

২৭। পাটের আবাদ কিরূপ? উৎকৃষ্ট পাটের লক্ষণ কি? প্রতি বিঘায় কত পাট জন্মিতে পারে?

২৮। তামাক উৎপাদনের নিয়ম লিখ? কোন্ কোন্ স্থানের তামাক পৃথিবীর মধ্যে বিখ্যাত?

২৯। কলার গাছ, পাতা, ফল প্রভৃতির যে সকল প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহা বল। কলাগাছের দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক কি ব্যবসায় চলিতে পারে?

৩০। পেপের আবাদ কি প্রণালীতে করিতে হয়? যাহারা পেপের আবাদ প্রথম করিবে, তাহাদের কিরূপ আশ্চর্য্য লাভ হইতে পারে? সকল স্থানের লোকে পেপের আবাদ করিয়া ঐরূপ লাভ করিতে পারে কি না?

৩১। ইক্ষু ও গোল-আলুর আবাদ প্রণালী বর্ণন কর। গোল আলুর আবাদে বিলক্ষণ লাভ আছে, তথাচ বঙ্গদেশের সকল জেলার কৃষকেরা উহা উৎপন্ন করে না কেন?

৩২। বৈশাখী ও কার্ত্তিকে চাষে যে সকল ফসল উৎপন্ন হয়, তাহাদের নাম কর। ফসল নাবি হইলে ক্ষতি কি?

৩৩। বর্ষার সময়ে ও বর্ষার অন্তে ফলবৃক্ষ সম্বন্ধে বিশেষ কর্ত্তব্য কি?

৩৪। কলমের চাবার দোষগুণ বর্ণন কর? যোড়কলম ও গুলকলম করিবার নিয়ম কি?